বুদ্বুদ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন প্রেস হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৪৩

মূল্য এক টাকা চারি আনা

নক্ষত্র বিষয়ক একখানা ইংরেজি বই সম্মুখে পড়িয়া ছিল। পাতা উল্টাইতেই হঠাৎ ছায়াপথের ফোটো-প্লেট খানি দৃষ্টিগোচর হইল। কেন জানিনা তৎক্ষণাৎ উহা হইতে আর চোখ ফিরাইতে পারিলাম না—হাতে দুই তিনটি কর্ত্তব্য ছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া উহারই দিকে চাহিয়া রহিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে নীহারিকাপুঞ্জ জীবন্ত হইয়া উঠিল; দেখিলাম, আকাশ-সমুদ্রের বুকে কোটি কোটি বুদ্বুদ যেন ফুটিয়া ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে।

কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল। অসীম কালকে এক ঘণ্টা পরিমাণ সময়ের মধ্যে পুরিয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাই প্রকাণ্ড একটা বুদ্বুদের মত ফাটিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

বিশ্ব-বুদ্বুদের সহিত পার্থিব ক্ষণজীবী বুদ্বুদের আত্মীয়তার কথা চিন্তা করিয়া বড়ই আনন্দ হইতেছে।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গীয় বিহারীলাল গোস্বামীর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

সূচী পত্র

হরগোবিন্দের বিবাহ

১

হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ছিপছিপে চেহারা, কলেজে পড়ে।

বিজয়বাবু ডাক্তার। হরগোবিন্দের মেস্‌এর পাশেই তাঁহার বাড়ী। অল্পদিন হইল পরস্পর আলাপ হইয়াছে।

বিজয়বাবু হরগোবিন্দের চেয়ে অন্তত দশ বৎসরের বড়। কিন্তু তিনি রসিক পুরুষ এবং হরগোবিন্দ সম্প্রতি আধুনিক তরুণধর্ম্মের প্রভাবে পড়িয়াছে। কাজেই দুইজনের মধ্যে একটু প্রীতির সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে।

বিজয়বাবু শ্বশুরহীন জামাতা—একটি শ্যালিকা বর্ত্তমানে তাঁহার ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। হরগোবিন্দের হাতে তাহাকে সমর্পণ করা চলিতে পারে কিনা, মনের মধ্যে এরূপ একটি প্রশ্ন জাগ্রত রাখিয়া তিনি তাহার সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি কথায় কথায় ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে তাহার অবস্থা খারাপ নহে, উপরন্তু তাহার নিজ নামে ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা জমা আছে।

কিন্তু এদিকে হরগোবিন্দের মধ্যে স্থানকাল নির্ব্বিশেষে প্রেমে পড়িবার লক্ষণসমূহ দিনে দিনে প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সুযোগ উপস্থিত হইলে সে যে-কোনো স্থানে নির্ভীকতার সহিত অগ্রসর হইতে পারে এরূপ কথা বন্ধুমহলে প্রচার করিতে ইতস্তত করিতেছে না।

এইরূপ অবস্থায় হরগোবিন্দ হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। পূজার ছুটিতে সে কোথাও যাইবে না এই কথাই সকলে জানিত, কিন্তু

সহসা তাহার মত পরিবর্ত্তনের কি হেতু থাকিতে পারে তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

বিজয়বাবুও কোন কারণ অনুমান করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় উক্ত হরগোবিন্দ, যেমন হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উন্মাদের মত চেহারা লইয়া একদিন বিজয়বাবুর কাছে আসিয়া বলিল, বিজয়বাবু, প্রেমে পড়েছি।

বিজয়বাবু মনে মনে কিছু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, ভাল কথা নয়।

হরগোবিন্দ কিছুমাত্র না দমিয়া বলিতে লাগিল, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় পুরী গেলাম, বন্ধুরা বলেছিল পূজার ছুটিতে পুরী না গেলে জীবন বৃথা। এখন দেখছি গিয়েও তথৈবচ। বিজয়বাবু, প্রেমে মানুষকে মহৎ করে এবং মানুষের সর্ব্বনাশও করে, কিন্তু তথাপি লাভ এই যে মাঝখান থেকে পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত জিনিস সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। আমার কাছে আজ বিশ্ব রঙীন হয়ে উঠেছে।

বিজয়বাবু বিষয়টিকে খেলো করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, জণ্ডিস্ হলে এরকম দেখায় বটে।

কথা কিছুক্ষণ এইভাবেই চলিতে লাগিল।

মনে হয় আমি অমৃত পান করছি।

তোমার কিছু বিটার্স খাওয়া উচিত, ধর যেমন চিরেতা, কালমেঘ, গুলঞ্চ।

বিজয়বাবু, কখনও প্রেমে পড়েছেন?

তুমি কখনো পীককের ব্রোমাইড খেয়েছ?

বলবেন না বিজয়বাবু, শিরায় শিরায় রক্ত মাতাল হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে।

স্যাচুরেটেড সল্যুশন অব ম্যাগসালফ—

বুক ধড়ফড় করছে—তার কথা মনে করতেই—

কিছু কার্ডিয়াক ষ্টিমুল্যাণ্ট—

ঠাট্টা নয় বিজয়বাবু, আপনার সঙ্গে অল্পদিনের আলাপ, কিন্তু প্রেমে প'ড়ে আপনাকে মনে হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু। ঠাট্টা করবেন না বিজয়বাবু, আপনার একটি কথাতে হয়ত আত্মহত্যা ক'রে বসব। আমার প্রেমকে অবিশ্বাস করবেন না।

অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু প্রেম ব্যাপারটা কি রকম জান? ঠিক জোয়ারের মত, আসে যখন ঠিকই আসে—কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না।

বিজয়বাবু, লজিক পড়া থাকলে আপনি এরকম ভুল করতেন না। ফল্‌স্ অ্যানালজিতে সত্য মারা পড়ে।

অ্যানালজি মিথ্যা হ'লেও প্যাথলজি ত মিথ্যা নয়।

অর্থাৎ আপনি বলতে চান, আমার মনে এই যে আগুন জ্বলেছে এ আমাকে পুড়িয়ে নিবে যাবে?

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বলেন কি বিজয়বাবু, সূর্য্যের মত যে উদ্দীপ্ত এবং ভাস্বর তা কি স্থায়ী নয়? সূর্য্য কি ক্ষণিকের?

মেয়েটি কে বল ত?

বিজয়বাবু, আপনি সত্যিই বিবেচক, আপনাকে সব বলব। শুনলেই বুঝতে পারবেন কি গোলমেলে অবস্থার মধ্যে পড়েছি। আমি তাকে দেখবামাত্র ভালবেসেছি, কিন্তু সে কে তা জানি না। সমুদ্র থেকে স্নান ক'রে সে তখন কেবল উঠছে—পিছনে তার অনন্ত আকাশ আর সীমাহীন সমুদ্র—সাম্‌নে আমি। আকাশ আর সমুদ্র যেন ষড়যন্ত্র

ক'রে তাকে আমার সামনে পৌঁছে দিয়ে গেল। আমি কি করি!—উপায়ান্তর না দেখে 'ফলো' করলাম। বাড়ির ঠিকানা পেলাম।

কুমারী, সধবা না বিধবা?

কিছুই জানি না।

বাড়ির ঠিকানা কি?

প্রশান্তি কুটীর।

প্রশান্তি কুটীর? বিজয়বাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, প্রশান্ত কুটীর? বল কি হে, এ যে ভয়ানক ইণ্টারেষ্টিং, তারপর, তাকে কিছু বলেছ?

কেবল বলেছি, 'দেবী', মুখ থেকে আর কিছু বেরোয়নি।

সে কিছু বলেছে?

না, কেবল হেসেছে।

এখন কি করতে চাও?

আপনার পরামর্শ নিতে।

মেয়েটির সম্বন্ধে আর কিছু জেনেছ?

কিছুই না।

তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও?

দুরাশা।

দুরাশা নয়—আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

ঠাট্টা করবেন না বিজয়বাবু।

ঠাট্টা করতে জানি না। আমি বরাবর সীরিয়স।

আপনি কি পুরী যাবেন?

আগামী সপ্তাহে।

আমাকে যেতে হবে?

বিলক্ষণ! তুমি আজই যাও।

আপনি কোথায় থাকবেন?

কোথায় থাকিবেন সে কথার উত্তর না দিয়া বিজয়বাবু হরগোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথায় থাকবে?

হোটেলে।

সেখানে দেখা করব।

২

বিজয়বাবু যথাসময়ে পুরী আসিয়া তাঁহার আত্মীয়-বাড়ীতে উঠিয়াছেন। বিজয়বাবু এবং হরগোবিন্দ পুরীর সমুদ্রতীরে আসীন। হরগোবিন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ঐ যে ঐ যে, সে আসছে।

বা, চমৎকার মেয়েটি ত।

আমি ত আর পাগল হইনি যে, যে-কোনো মেয়েকে দেখে ক্ষেপে উঠব!

তোমার বুদ্ধি আছে।

কিন্তু আমার বুদ্ধিতে আর কিছু করতে পারছি না।

সে সব আমার উপর ছেড়ে দাও। কৃতকার্য্য হ'লে কি পুরস্কার পাব?

আপনার রোগী জুটিয়ে দেব—আপনার জন্যে প্রাণপণে ক্যানভাস্ করব।

বেশ, কিন্তু মেয়েটি যদি ব্রাহ্মণ না হয়?

ইনটারকাস্‌টেই আমার ঝোঁক।

শেষে যদি মত বদলাও?

আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, মত বদলাব না।

ঠিক ?

ঠিক।

৩

বিজয়বাবু রাত্রি দশটার সময় হরগোবিন্দের কাছে আসিয়াই বলিলেন, সব ঠিক, এখন ভগবানের ইচ্ছা।

বলেন কি বিজয়বাবু, এত শীগগির হয়ে গেল ?

নিজের উপর বিশ্বাস না থাকলে এতে হাত দিই ?

সব খুলে বলুন।

সব খুলে বলব না।—ভগবান তুমিই সত্য।

আপনার মুখে ভগবানের নাম শুনলেই নানারকম আশঙ্কা হয়—আপনি যা-হোক একটা কিছু ভাল কথা বলুন।

মেয়েটি ব্রাহ্মণ, গোত্রেও আটকাচ্ছে না, অভিভাবককেও রাজি করিয়েছি—কিন্তু—

কিন্তু কি বিজয়বাবু ?

মেয়েটির অবস্থা ভাল নয়।

আমি পণপ্রথার বিরোধী।

তোমার কথা ত ভাবছি না, আমি ভাবছি মেয়েটির কথা।

সে ভাবনা ত আমার উপরেই ছেড়ে দিচ্ছেন।

মেয়ের মা ইচ্ছা করেন যে, তুমি কিছু টাকা মেয়েটির নামে জমা রাখ। আর তোমার যদি আপত্তি থাকে—

আপত্তি! কি যে বলেন! আমার যা-কিছু আছে সবই ত তার হবে।

সেটা ত হ'ল ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমানের দাবী বর্ত্তমানে মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু তোমার হয়ত অসুবিধা থাকতে পারে—আর হৃদয় যখন স্ফীত হ'য়ে ওঠে, পকেটের কথা লোকে ভাবে না।

আপনি একথা বিশ্বাস করেন?

মেয়ের মা এই রকম বিশ্বাস করেন।

কত চাই সেইটে বলুন না।

হাজার দশেক হলেই রাজি হবে বলে মনে হয়।

আশ্চর্য্য! ঠিক ঐ টাকাটাই ত আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা আছে!

তবে ত কোনো গোলমালই নাই।

বিজয়বাবু, কাজটা যে এত সহজ তা আগে ভাবতেই পারিনি। কিন্তু আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল যে পাব, পাব, তাকে পাব। শকুন্তলা উপাখ্যান পড়েছেন নিশ্চয়ই—দুষ্মন্ত যখন প্রথম শকুন্তলাকে দেখতে পেলেন—

কিন্তু রাত যে এগারোটা হ'ল, এখন দুষ্মন্ত-কাহিনী ঠিক জমবে বলে মনে হয় না।

বুঝেছি। ডাক্তার মানুষ, আপনাদের কাছে হৃদয় মানেই হৃদ্‌যন্ত্র—এর বেশি আপনারা ভাবতে পারেন না। কিন্তু—

সময়ে ভাবি বৈ কি। তবে ওর আসলে কোনো মানে নেই।

মানে নেই?

এই ধর না তোমার বিয়ে ঠিক করতে এসে আমার নিজেরই বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আপনি ত বিবাহিত।

হ'লে কি হয়—মেয়েটি ঠিক আমার স্ত্রীর মত দেখতে।

ভদ্রলোকের মেয়ে সম্বন্ধে এ সব বলতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না?

আমরা যে ডাক্তার। সেন্টিমেণ্ট নেই।

তাতে কি এসে যায়? আপনি ত জানেন, সে আমার স্ত্রী হ'তে যাচ্ছে।

জানি বলেই ত হিংসা হচ্ছে।

না না, আপনি ঠাট্টা করছেন।

অব্-কোর্স ঠাট্টা। না হ'লে তোমার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করলাম কেন—আমি নিজেই ত বিয়ে করতে পারতাম।

আচ্ছা, এখন যদি আমি টাকাটা ওর নামে ট্র্যান্সফার করি, তা হ'লে সাত দিনের ভিতর সব শেষ ক'রে দিতে পারবেন? কথা দিন।

কথা দিচ্ছি।

৪

শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু হরগোবিন্দ দুই দিন হইল বড় গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। বিজয়বাবু তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অনেক অনুরোধের পর হরগোবিন্দ কথা কহিল।

বিজয়বাবু!

কি?

এরকম চাতুরী করবার মানে কি?

দায়ে পড়ে করেছি, কিন্তু ঠকেছ কি?

ঠকিনি, কিন্তু লজ্জা পাচ্ছি।

ও কিছু না, বোধ হয় লিভারটা একটু খারাপ হয়েছে।

লজ্জা কি আর-কিছুতে হয় না?

না।

শেষ পর্য্যন্তও আমাকে সব খুলে বললেন না কেন? আমি ত বিয়ে করতে বরাবরই রাজি ছিলাম।

তোমার আগ্রহ বাড়াবার জন্যে। বললেই হয়ত সব মাটি হত।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না। ইতিপূর্ব্বে অন্তত পাঁচজনের কাছে আগ্রহ দেখিয়েছি, কিন্তু কিছু হয়নি।

তারাও কি প্রেমে পড়েছিল?

না। তবে সমুদ্রের তীরে একা দেখলে কি হত বলা যায় না।

ঠিক বলেছেন, এই একা দেখাতেই সর্ব্বনাশ।

বল কি হে—এর মধ্যেই অনুতাপ আরম্ভ হ'ল?

অনুতাপ? আমার মত সুখী আজ পৃথিবীতে কেউ নেই।

যতদিন এরকম ভাববে, ততদিন স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

কিন্তু আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেছিলেন।

কখনো না।

টাকাটা প্রতিভার নামে আগেই লিখিয়ে নিলেন কেন?

ওটা অবিশ্বাসের দরুন নয়, সায়েন্সে বিশ্বাস করি বলে করেছি।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ এটা একটা সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেণ্ট। মেয়ের পক্ষ থেকে আগ্রহ বেশি হলে, ছেলে টাকা পায়, সুতরাং ছেলের পক্ষ থেকে আগ্রহ

বেশি হলে মেয়েই টাকা পাবে। আগ্রহের সঙ্গে পণ-প্রথার সম্বন্ধ এক্সপেরিমেণ্ট করছিলাম।

আপনার উপর যা রাগ হচ্ছে! প্রতিভাকে দিয়ে এখন আপনার কান মলাতে পারলে কতকটা তৃপ্তি হবে।

শালীর জন্যে একটা কান আমি বরাবর প্রস্তুত রেখেছি, কিন্তু কানে হাত দেবার পূর্ব্বে হাত যেন ষ্টেরিলাইজ করে নেয়, আমিও কান ষ্টেরিলাইজ করা সম্বন্ধে দায়ী রইলাম।

দেবু সেনের উলট-দর্শন

তিনচারি দিন ধরিয়া ভোরের বেলা সারকুলার রোডের একটি বাড়ির ছাদে একটি অদ্ভুত কাণ্ড দেখা যাইতেছে।

বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, সজ্জন, অমায়িক, সদভিপ্রায়ী দেবু সেন হঠাৎ আকাশের দিকে পা তুলিয়া দিয়া হাতে ভর করিয়া ছাদের উপর উণ্টা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কলিকাতা শহরের নামকরা হাস্য-বিরোধী খিটখিটে গম্ভীর প্রকৃতির লোকটির বাড়ি দেবুর বাড়ির সন্নিকটে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তিনি এ দৃশ্য দেখিয়া প্রথমত গোঁফ ফুলাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হাসিয়াছেন।

দেবুকে জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীর হইয়া থাকে, বেশি কথা বলে না। সেদিন বিশেষ পীড়াপীড়ি করাতে বলিয়াছে,—জানিয়া লাভ কি?

আমাদের দুঃখ, চার্লি চ্যাপলিনের দুঃখ। প্রাণান্তকর, কিন্তু লোকে দেখিয়া হাসে।

ইহাই গল্পের শেষ অধ্যায়, সুতরাং আরম্ভে যাওয়া যাক।—যে কথাটি এইমাত্র দেবুর মারফৎ শোনা গেল, সে রকম সহজভাবে সে কখনো কথা বলে না। থিওরি-অব-রিলেটিভিটি তাহাকে পাগল করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে দেখা হইলে কখনো বলিত, আমরা মরিয়া গিয়াছি এবং আমরা জন্মি নাই এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। আবার কখনো বলিত, আমাদের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নাই, কোনো-না-কোনো বস্তুর তুলনায় এবং সম্পর্কে আমরা টিকিয়া আছি মাত্র।

সে বলিত, পৃথিবী যে দিন জলে আবৃত ছিল সেই দিনকার আলো যে-গ্রহে আজ এইমাত্র গিয়া পৌছিল, সেই গ্রহের লোকেরা যদি দেখিতে পায় তবে দেখিবে অদ্যকার তারিখে পৃথিবী জলমগ্ন অবস্থায় আছে; এখনো ইহাতে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মায় নাই। কাজেই কাহারো কাহারো কাছে আমরা এখনো সুদূর ভবিষ্যৎ। আমরা যে জন্মগ্রহণ করি নাই ইহা তাহাদের কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য।

দেবু সেনের শেষ কথা—এ জগতের সমস্ত মায়া, আমরা কেমন করিয়া যে সব-কিছুকে মানিয়া লইতেছি ইহা এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার।

দেবু আইনষ্টাইনের শিষ্য। সে দিনের পর দিন অঙ্ক কষিতেছে, গবেষণা করিতেছে, এবং এই বিশ্বের যে সীমা আছে, অসীম বলিয়া যে কোনো বস্তু নাই, এইটি বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করিবার জন্য সে নৈনিতাল গিয়া গত বৈশাখ মাসে একটি বাড়ি ভাড়া লইয়াছে। তার সঙ্গে আছে তার এক শিষ্য আর এক ভৃত্য।

সৌভাগ্যক্রমে একটি বাঙালী-পরিবারের সঙ্গে দেবুর পরিচয় হইল—তাঁহারা কিছুদিন ধরিয়া সেইখানে আছেন।

প্রথম পরিচয়ের সময় সে-পরিবারে নায়িকা হইবার মত কেহ ছিল না—মাত্র একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁহার শিশু-সন্তানসহ স্ত্রী, আর একটি কুকুর। কিন্তু নায়িকার আমদানি হইল।

ভদ্রলোকের বিশ বৎসর বয়সের কন্যা শ্রীমতী ইন্দু কলিকাতায় আই-এ পড়ে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে পিতামাতার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল।

দেবু যেদিন ইন্দুর সঙ্গে আলাপ করে সেদিন তাহার আপেক্ষিকতার উচ্ছ্বাস অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, এবং ইন্দু তৎক্ষণাৎ দেবুকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলে। দেবু বলিয়াছিল, কোনো বস্তুকে অত্যন্ত বড় বলাও যা, অত্যন্ত ছোট বলাও তাই। সমস্তই আপেক্ষিক। যে এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিল, যদি বলি তাহার প্রপৌত্রকে আমি দেখিতেছি তাহা হইলে অসম্ভব বলা হয় না।

দেবু বলে, আমি এখুনি প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে আমরা অভিব্যক্তির আদিম যুগে কোষ-জীবন যাপন করিতেছি—তুমি একটি জীব-কোষ, আমি একটি জীব-কোষ, আমাদের ভবিষ্যতে কি পরিণতি হইবে আমরা কেহ জানি না।

ইন্দু বলে, প্রমাণ করিতে হইবে না, আমি সমস্ত মানিয়া লইতেছি। দেবু বলে, আমি মরিয়া গিয়াছি। ইন্দু বলে, ঐ সঙ্গে আমিও জীবিত নাই। দেবু আপত্তি করিয়া বলে, আমি যে অতীত হইয়াছি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ইন্দুকে বর্ত্তমান থাকিতে হয়।

ইন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনে।

সুদীর্ঘ গ্রীষ্মকাল চলিয়া যায়। দেবু প্রচার করিল, নৈনিতালে যাহা

সংগ্রহ করিলাম, ওয়াল্টেয়ারে গিয়া তাহা যাচাই করিতে হইবে। প্রমাণগুলি মিলিয়া গেলেই জানা যাইবে বিশ্ব সীমাহীন নহে।

অবশেষে যাইবার মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসে। ইন্দু কোনো কথা খুঁজিয়া পায় না, তাহার চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। দেবু তাহা দেখিয়া বলে, চমৎকার। সে বলে, এই অশ্রুর পিছনে দুঃখের মাত্রা কম। দুঃখে অশ্রু শুকাইয়া যায়। যাহারা মুক্ত আকাশের নীচে পথে বাস করে, হাওয়া এবং জল খাইয়া দিন কাটায়, তাহাদের অশ্রু নাই। ইন্দুর অশ্রু বিলাসিতার অশ্রু, যাহাদের নিজের উপর অত্যন্ত মায়া তাহাদের চোখেই অশ্রু দেখা যায়।

দেবু ইন্দুর চোখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলে, অশ্রুপাতের আপেক্ষিকতার উপরে একটি থীসিস্ লিখিব।

ইন্দু নিজের ব্যথা প্রাণপণে গোপন করিয়া রসিকতা করিবার চেষ্টা করে। বলে, যা চেহারা হইতেছে, থাইসিস না হয়।

দেবু বলে, আমার কর্ম্মক্ষেত্র হিমালয়ে, না হয় মহাসমুদ্রের উপকূলে —থাইসিস তার ত্রিসীমানায় থাকে না। অথচ থাকে। সমস্তই আপেক্ষিক কিনা! আর বিশ্বটাও ত অনন্ত নয়। তুমি আজ এখান হইতে সীমাহীন পথে, সীমাহীন কালের মধ্যে যাত্রা কর, দেখিবে বহু লক্ষ বৎসর পরে আবার এইখানেই ফিরিয়া আসিয়াছ। আমাদের পৃথিবীটা গোলাকার, আমাদের গতিকে কোথাও বাধা দেয় না—তাই বলিয়া পৃথিবী কি সীমাহীন?

ইন্দু বলে, কিন্তু আমার ব্যথা যে অনন্ত। দেবু বলে, তাহা হইলে সে ব্যথা মালিশে সারিবে।

অবশেষে দেবু বিদায় লয়। ইন্দুর বাপমায়ের আন্তরিক অনুরোধ,

কুকুরের করুণ নয়নে চাহিয়া থাকা, এবং ইন্দুর অশ্রুপাত, সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া দেবু কলিকাতার পথে রওনা হইয়া গেল। ট্রেনে বসিয়া দেবু বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করে। তাহার মনে হয়, হৃদ্‌পিণ্ডটা কে যেন দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—এইমাত্র দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। দেবু স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ইন্দুর চোখ হইতে অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে এক একটি করিয়া জগৎ খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, এবং তাহা শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। দেবু ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। সে হঠাৎ তাহার পাশে উপবিষ্ট অপরিচিত একটি বাঙালী যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, মহাশয়, আপনি কাহারো চোখের জল দেখিয়াছেন?

ভদ্রলোকটি সবে মাত্র একটি সিগারেট ধরাইয়াছিলেন, কিন্তু সজোরে একটিমাত্র টান দিয়াই সিগারেটটি ফেলিয়া দিলেন, এবং দেবুর কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, চোখের জল? উহা লইয়াই গবেষণা করিতেছি আজ পাঁচ বৎসর। শিশুর অশ্রু হইতে বৃদ্ধের অশ্রু সবই আমি পরীক্ষা করিয়াছি। মহাশয়, একদিনের শিশুর অশ্রু হইতে এক বৎসরের শিশুর অশ্রু তফাৎ করিতে শিখুন, তারপর সৎলোকের হইতে অসতের, স্ত্রীর হইতে পুরুষের, সুস্থ লোকের হইতে অসুস্থ লোকের—কিন্তু মহাশয় এ সব আপাতত থাক। আমার বাড়িতে ল্যাবরেটরি করিয়াছি, পাঁচশত প্রকার অশ্রু ধরা আছে,—যদি কখনো যান, দেখিবেন। সম্প্রতি যে অশ্রুর নমুনা আমি সঙ্গে বহন করিতেছি, সেইটির কথাই বলি।

দেবু অবাক হইয়া ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

ভদ্রলোকটি বলিতে থাকেন, মাণিক মণ্ডল জমিদারের অত্যাচারে গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে আসিয়া বাসা বাঁধিল। সেখানে জনমানব নাই। অবস্থা চরম খারাপ, তাহার উপর আবার দুইটি পোষ্য—স্ত্রী আর

ছয় মাসের একটি শিশু। বর্ষাকাল, ঘরের চালে খড়ের অভাব, বৃষ্টিতে সব ভিজিয়া যায়। ছেলেটির প্রবল জ্বর। বৃষ্টির হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য মা তাহাকে কোলের ভিতর চাপিয়া বসিয়া আছে। রাত্রি বাড়িতে থাকে, জ্বরও বাড়িয়া যায়। মাণিক অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল। কিন্তু ডাক্তার সহজে আসিতে চাহে না। অমন দুর্যোগে কেউ আসে না, বিশেষ করিয়া গরিবের বাড়ি। অনেক হাতেপায়ে ধরিয়া সে একজনকে রাজি করাইয়া লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আসিয়া দেখে ছেলেটি মরিয়া গিয়াছে, এবং শোক সামলাইতে না পারিয়া স্ত্রীও আত্মহত্যা করিয়াছে।

মাণিক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু ডাক্তার তার ফী কিছুতে ছাড়ে না। মাণিকের কিছুই ছিল না, ডাক্তারকে দিবে বলিয়া তাহার স্ত্রী আঁচলে দুইটি টাকা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, মাণিক তাহার মৃত স্ত্রীর আঁচল হইতে টাকা দুইটি খুলিয়া ডাক্তারকে দেয়, তবে ডাক্তার শান্ত হইয়া চলিয়া যায়।

তখন সকাল হইয়া গিয়াছে, আমি সেই পথ দিয়া আসিতেছিলাম। আমি দেখিয়াছি মাণিকেব কান্না। সে রকম কান্না এ পৃথিবীর আর কেউ কোথাও দেখিয়াছে কিনা জানি না। দুই হাতে বুক চাপড়াইয়া, মাটিতে গড়াইয়া অসহায় শিশুর মত চীৎকার করিতে লাগিল। সমস্ত বর্ষার আকাশ যদি একটি বিদ্যুতের আঘাতে ফাটিয়া অবিরাম জল হইয়া ঝরিয়া পড়িত, তবে মাণিকের অশ্রুর সঙ্গে তাহার তুলনা করা যাইত। সে যখন কাঁদিতেছিল তখন তাহাকে তুলিয়া বসাইয়া দিয়া তাহার চোখের নীচে এই চার আউন্স শিশিটি ধরিয়াছিলাম। মহাশয়, ইহার রঙ দেখিতেছেন?—ইহা অশ্রু নয়, রক্ত।

দেবু চঞ্চল হইয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, আর শুনিতে চাই না, আপনি থামুন।

দেবুর মন ভারি হইয়া আসে।

ভদ্রলোকটি দেবুর হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিয়া বলে, সেটা আর হয় না, আপনাকে শেষ পর্যান্ত শুনিতে হইবে। আমার পাঁচ মাইল পরে নামিবার কথা, কিন্তু আপনার জন্য পঞ্চাশ মাইল চলিয়া আসিয়াছি, যদি না শুনিতে চান, বাড়তি মাশুলটি আপনাকে দিতে হয়, —বলিয়া ভদ্রলোকটি দাঁত বাহির করে।

দেবু শিহরিয়া ওঠে। বলে, তাই লউন, কিন্তু আর শুনিতে পারিব না,—বলিয়া দশ টাকার নোট তাহার হাতে দেয়। ভদ্রলোকটি ধন্যবাদ দিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া যায়।

দেবুর চঞ্চলতা ক্রমে বাড়িয়া ওঠে। মাণিকের অশ্রুর কথা শুনিয়া দেবুর ইন্দুর অশ্রু মনে পড়ে। তাহার এক বিন্দু অশ্রু মনের সম্মুখে রাখিয়া দেবু কল্পনায় নিজেকে ছোট করিতে লাগিল। ছোট করিতে করিতে দেবু অণু, পরমাণু—শেষে ইলেক্ট্রন-প্রোটনের মত তেজ-বিন্দুতে পরিণত হইল। এই অবস্থায় সে ইন্দুর ঐ একবিন্দু অশ্রুর দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল। দেখিল, সে মানুষ থাকিতে সূর্য্যকে যত বড় জানিত,—এই অশ্রুবিন্দু এখন তাহা হইতে লক্ষ গুণ বড়। অথচ এই বিরাট বিশাল অশ্রুবিন্দুগুলি ইন্দুর চোখ হইতে ঝরাইবার হেতু দেবু নিজে। দেবুর নিজের উপর ধিক্কার আসিল, এবং ঐ সঙ্গে সে তেজের অবস্থা ত্যাগ করিয়া আবার সাধারণ মানুষের আকৃতি গ্রহণ করিল।

দেবুর বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ় হইতে লাগিল যে, সমস্ত বিশ্ব ঠিক আছে সে উল্টাইয়া গিয়াছে, নহিলে সে সহজভাবে কিছু করিতে পারিতেছে না

কেন? ইহা প্রত্যক্ষ কবিবার জন্য সে একদিন ছাদে গিয়া উল্টা হইয়া দেখিতে লাগিল, পৃথিবীর সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবে কিনা।—বাল্যকালে পা আকাশে তুলিয়া হাতে হাঁটা সে অনেকদিন অভ্যাস করিয়াছিল।

উল্টা হইয়া প্রায় পনের মিনিট ছাদে ঘুরিয়াও দেবু বুঝিতে পারিল না, পৃথিবী উল্টাইয়াছে কি সে নিজে উল্টাইয়াছে। কিন্তু সে একটি নূতন তথ্যের সন্ধান পাইল।

সে যখন আকাশে পা তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন সে হঠাৎ আবিষ্কার করিল, কাছেই একটা বাড়ির ছাদ হইতে অনেকগুলি মেয়ে তাহাকে দেখিতেছে, এবং দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল নিজের নিষ্ফল জীবনের কথা। সে কাহাকেও আজ পর্য্যন্ত আনন্দ দিতে পারে নাই, অথচ তাহার আনন্দ দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। সে স্থির করিল, আর নয়, এখন হইতে কাহাকেও আর দুঃখ দেওয়া হইবে না। ইন্দুর কথা মনে করিয়া সে সমস্ত নারীজাতির উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাহাদেরই কয়েকজন খুশী হয় বলিয়া সে এখন রোজ ভোরে ছাদের উপর আকাশে পা তুলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

দেবু বলে, সে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিল, অথচ তাহার এই খুশী করিবার প্রবৃত্তি দিনের পর দিন বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। এমনকি সে যে স্থায়ীভাবে উল্টা হইয়া যাইবে এরূপ লক্ষণসমূহ তাহার মধ্যে ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এখন দেবুকে সোজা করিবে কে?

অসবর্ণা

আমি মাত্র তিনদিন হইল একটি বিবাহ করিয়া দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছি।

বাংলাদেশে যতগুলি খবরের কাগজ বাহির হয় তাহার বারো-আনা পরিমাণ আমাকে প্রশংসা করিয়াছেন, এবং বাকী চারি-আনা আমাকে নরকে পাঠাইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

একজন বলিয়াছেন, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় অসবর্ণ বিবাহ করিয়া এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেন যাহা অনুসরণ করিলে ভারতবর্ষ অস্পৃশ্যতা-দোষ মুক্ত হইয়া সমগ্র জগতের পূজ্য হইয়া উঠিবে।

অপর একজন বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর প্রায়োপবেশন উপলক্ষে অনেকে অনেক প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন, কিন্তু ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের মত এরকম হাতেকলমে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে কেহই সমর্থ হন নাই।

বিপক্ষীয়দের মন্তব্যগুলি পড়িলে দুর্ব্বলের দৌর্ব্বল্য ঘুচিয়া যায়—মৃতের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয়।

একজন বলেন, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় চণ্ডীদাস হইবার চেষ্টায় রজকিনী রামীর—ইহার পর আর লেখা যায় না।

আর একজন বলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিলেন। তিনি অস্পৃশ্যজাতীয়া একটি নার্সকে ব্রাহ্মণত্বে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে স্ত্রীরূপে ঘরে তুলিয়াছেন।

আর একজন বলেন,—কিন্তু থাক, তাহার কথা না বলাই ভাল।

আমার বহু দুঃখের মধ্যে একটি দুঃখ এই যে, আমার বিরুদ্ধে যে কাগজখানি সকলের চেয়ে জঘন্য ইঙ্গিত করিয়াছে, সেই কাগজখানি আমার অর্থসাহায্যে চলে। কিন্তু যাহারা বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের বিশেষ দোষ নাই। অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে আমিই এতকাল নানারূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছি, এবং সাধারণে এমন সব কথা প্রচার করিয়াছি যে তাহারা যদি এখন আমার প্রাণ লইতে চায় তবে তাহারও প্রতিবাদ করি এমন উপায় নাই।

তিনদিন আগে আমি ছিলাম একসঙ্গে তিন।—ছিলাম ডাক্তার, ছিলাম লেখক, ছিলাম সমাজসংস্কারক। সংস্কার অর্থে ম্লেচ্ছভাব দূর করিয়া সমাজে সনাতন ভাব ফিরাইয়া আনা।—ইহার জন্য মুক্তহস্তে দানও করিয়াছি।

কিন্তু আজ ৩০শে আশ্বিন আমি মাত্র এক। আমি ডাক্তার। আমি লেখক নহি, কেননা যাহার মতের স্থিরতা নাই, তাহার লেখারও কোনো মূল্য নাই। আর সমাজসংস্কারক হওয়া দূরে থাক—লোকে বলিতেছে আমি সনাতন সমাজের কটিদেশ ভাঙিয়া দিয়াছি।

মাত্র নিজের ব্যবস্থা-সঙ্গত ঔষধ দিবার জন্য আমার একটি ছোট ডাক্তারখানা আছে। আমি সাধারণত সেখানে সকালে এবং সন্ধ্যায় উপস্থিত থাকি। সেদিন অনেকগুলি রোগী দেখিয়া ফিরিতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। আমি ডাক্তারখানায় বসিয়া কতকগুলি ব্যবস্থাপত্র লিখিতেছি, এমনসময় একটি আধুনিক ধরণে সজ্জিতা স্ত্রীলোক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমিও লেখা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ডাক্তারি ব্যবসা খুব বেশি দিনের নহে, তবু নিজের আসনটিতে বসিয়া থাকিলে কখনো কোনো রোগী বা ক্রেতা আসিলে উঠিয়া দাঁড়াই না। তথাপি কেন যে দাঁড়াইলাম,

তাহার কারণ এখন বিশ্লেষণ করিলে এই বুঝিতে পারি যে তাহার চেহারার ভিতরে এমন একটা কিছু ছিল যাহাতে একটা ডাক্তার অনায়াসে ভুলিয়া যাইতে পারে যে সে ডাক্তার।

কিন্তু এমন একটা কিছুর ত অর্থ হয় না। তাহার গায়ের রং মলিন, তাহার সামনের দাঁতগুলি উঁচু, ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিলেও বাহির হইয়া থাকে; ক্রমাগত পান খাইয়া সে দাঁতের উপরেও একটা আবরণ পড়িয়াছে। বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে।

গাল দুইটি একেবারে গোল, কিন্তু চোখ দুইটি অত্যন্ত বড়। মনে হয় তাহার চাহনিতেই কোনো একটা বিশেষত্ব ছিল, কিন্তু মনের অপর একটা অংশ বলিতেছে, আমি নাকি অমন চেহারা দেখিয়া ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলেই মন দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। এক ভাগ বলে, তোমার জীবনে তাহার আবির্ভাব বড়ই মঙ্গলময়,—আর এক ভাগ বলে, মিস্ হীরাপ্রভা রায় তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।

আমার বন্ধুগণ কিন্তু গোড়া হইতেই আমার সর্ব্বনাশ কামনা করিতেছেন।

স্ত্রীলোকটি নমস্কার করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, দয়া করে এই খামখানায় একটা ঠিকানা লিখে দিন না।

আমি প্রতি-নমস্কার করিয়া খামখানা লইলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, কি লিখতে হবে?

লিখুন, মিস্ নীরপ্রভা রায়…নার্স…কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঠিকানা লিখিয়া দিলাম, স্ত্রীলোকটি তাহা লইয়া চলিয়া গেল।

একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের নামধাম লিখিয়া দিয়া সমস্ত শরীরে বেশ একটু আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল। স্বীকার করিতে সঙ্কোচ নাই যে এরূপ হিল্লোল বহা ভাল নহে, কিন্তু ইহাতে আমার একার দোষ খুব বেশি নাই। চিরকালের মানুষের মজ্জায় এই হিল্লোল ঢুকিয়াছে, এবং আবহমানকাল হইতে পুরুষ কবিতায় গাথায় এই ভাব প্রচার করিয়া আসিতেছে।

মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় কত মেয়ের চামড়া ছাড়াইয়াছি। তখন মনে হইয়াছে দেহটা একটা জটিল যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নহে। আবার যখন সমাজের কাজে লাগিয়াছি তখন মনুসংহিতার সঙ্গে মত মিলাইয়া দেখিয়াছি, সমগ্র স্ত্রীলোকটাই একটি যন্ত্র। সে সমাজ-ধর্ম্মের যন্ত্র, গৃহ-কর্ম্মের যন্ত্র, সন্তানলাভের যন্ত্র। কিন্তু সেদিন ডাক্তার-খানায় বসিয়া কি এক কবিতার হাওয়া মনের উপর দিয়া বহিয়া গেল—যন্ত্রসম্বন্ধীয় কোনো কথা মনেই পড়িল না।

এইখানেই ত মানিতে হয় যে দৈববিধান বলিয়া কিছু আছে। যে ভদ্রলোক ডাক্তারি পাস করিয়া দুই বৎসর ব্যবসা করিতেছে এবং যাহার পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইয়া লোকে তাহাকে সমাজ-সংস্কারক বলিয়া মানিয়া লইতে ইতস্তত করে নাই, সেই লোকটিকে হঠাৎ অসবর্ণ-বিবাহ করিতে হইল কেন, ইহার কারণ যদি দশ জন লোকেও অনুমান করে, তাহা হইলে দশ জন লোকেই সেই একই কথা বলিবে যে ইহা দৈবের লীলা, এবং আমিও প্রায় ইহা স্বীকার করি। কিন্তু যাহাদের মন বৈজ্ঞানিক-মন নহে, কারণ-অনুসন্ধান করিতে যাহারা ভয় পায়, তাহাদেরই নানা জনে নানা কথা রটাইতেছে।

খামে যেদিন ঠিকানা লিখিলাম সেদিনকার ইতিহাস বলিয়াছি। সেদিন আমার হাত যে একটু কাঁপিয়াছিল, মন যে একটু পুলকিত হইয়াছিল তাহা নিতান্তই অন্তর্মুখী, বাহিরে তাহার কোনো প্রকাশ ছিল না।

এ সব ব্যাপার নিভৃতেই ঘটে এবং নিভৃতেই শেষ হইয়া যায়, সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই ইহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তোলা হয়। তখন সে উহার প্রাপ্য মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য আদায় করিয়া লয়।

যে নাম-ঠিকানা সেদিন লিখিয়াছিলাম, আজও সেই নামঠিকানা লিখিয়া এইমাত্র একখানা চিঠি ডাকে দিলাম। এবং এইরূপ ক্রমাগতই দিতে থাকিব এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রথম দিনের পর সাতদিন সেই স্ত্রীলোকটি আমার নিকট নিয়মিত আসিয়াছে এবং সাতখানি খামে ঠিকানা লিখাইয়া লইয়াছে।

আমি ভাবিয়াছি, নার্স—ডাক্তারের সঙ্গে একটু পরিচিত হইবার সুযোগ খুঁজিতেছে। ব্যবসার বাজার মন্দা, করিবেই ত। কেবল চিন্তা করিতেছিলাম, কবে আসল কথাটি পাড়িবে এবং আমি তাহার উত্তরে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গিয়া নিজের মর্য্যাদা রাখিব।

সাতদিন পরে কথা পাড়িল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনবরূপে। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ফী কত? আমি বলিলাম, সাধারণত দুই টাকা।

স্ত্রীলোকটি বলিল, আর স্ত্রীলোকটি কেন, হীরাপ্রভা বলিল, একটি কেস্ আছে, এখুনি যেতে হবে।

আমি খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কেস্?

হীরাপ্রভা বলিল, বুকে ব্যথা।

আমি যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া গাড়িতে বসিয়া ষ্টার্ট দিলাম। বলা বাহুল্য হীরাপ্রভা আমার পাশে বসিল।

রোগী দেখা হইল। কিছুই বুঝিলাম না। ব্রঙ্কাইটিস্ নিউমোনিয়া প্লুরিসির কোন আভাস নাই। সন্ধ্যায় জ্বর হওয়া, রাত্রে ঘাম হওয়ার কোনো ইতিহাস নাই।

রোগিণীর বয়স উনিশকুড়ি হইবে, গায়ের রঙ মলিন; হীরাপ্রভার সঙ্গে চেহারার অনেকটা মিল আছে, শুনিলাম তাহার বোন। একটা মালিশের ব্যবস্থা করিয়া দুইটি টাকা লইয়া বিদায় হইলাম।

কিন্তু নিস্তার পাইলাম না, পরদিন হীরাপ্রভা ঠিকসময় আবার আসিয়া দেখা দিল। শুনিলাম ব্যথা ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে, আমাকে আবার যাইতে হইবে, দেরী করিলে চলিবে না।

গেলাম। রোগিণীর পাশে বসিয়া বুক পরীক্ষা করিতেছি এমন সময় দরজার বাহির হইতে শিকল-আঁটার শব্দ,—সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীর লাফাইয়া ওঠা এবং দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরা।

কানে ষ্টেথোস্কোপ ঝুলিতেছে, গলায় ঝুলিতেছে রোগিণী।

রোগিণী, অর্থাৎ নীরপ্রভা বলিল, ইংরেজিতে চিঠি লিখেছ কেন ভাই, আমি কি সব কথা বুঝি?

সহসা মনে করিতে যাইতেছিলাম, এটা বিকার, বড় খারাপ লক্ষণ, কিন্তু জানালার দিক হইতে হীরাপ্রভার উচ্চ হাসির শব্দ কানে আসিল, এবং তখনি বুঝিলাম, একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছি।

মেয়েদিগকে যন্ত্র হিসাবেই জানিতাম, উহারা যে যন্ত্রী হইতে পারে, তাহা এই প্রথম বুঝিলাম।

কথায় কথায় বিহ্বল হইয়া পড়া আমার স্বভাব নহে, বিশেষত ডাক্তারদের মাথা ঠিক রাখা একটা বিদ্যা—বহু সাধনায় অর্জ্জিত।

আমি কণ্ঠদেশ হইতে নীরপ্রভার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বুকের ব্যথা কি তবে—

কথা শেষ না করিতেই সে বুকে হাত দিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, ব্যথা নয়ত কি ? কি নিষ্ঠুরটাই হ'তে পার মাইরি। চিঠি লিখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো, এবারে আর ছাড়ছি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন চিঠি ?

নীরপ্রভা একখানা খাম বাহির করিয়া আমার সামনে ফেলিয়া দিল। দেখিলাম নাম-ঠিকানা লেখাটা আমারি বটে। খামখানা খুলিয়া দেখিলাম টাইপকরা প্রকাণ্ড প্রেমপত্র, নীচে আমার স্বাক্ষর ;—অন্তত আমার স্বাক্ষর নয় বলিবার উপায় নাই, প্রেসক্রিপশনের উপর ঠিক এই ভাবেই সই করিয়া থাকি।

হীরাপ্রভা বাহির হইতে বলিল, ঐ রকম বহু চিঠি আপনি লিখেছেন, আপাতত সাতখানা ওর কাছে আছে। চিঠি লিখেছেন আর গোপনে সাক্ষাৎ করেছেন। যদি কেলেঙ্কারী করতে না চান, তা' হ'লে বিয়েটা রেজেষ্টারি হয়ে যাক।

আমি যত চিঠি লিখিয়াছি বলিয়া শুনিলাম, তাহার উপর আর একখানি বাংলা চিঠি যোগ করিতে হইল। তাহাতে লিখিলাম,— তোমাকে বিবাহ করিব, কেননা তোমার সঙ্গে আমার এতদিনের প্রণয় আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই চিঠিখানা বাধ্য হইয়া লিখিয়াছিলাম, কেননা চিঠি না লিখিলে আমি আর নীরপ্রভা যে একত্র রহিয়া প্রণয় করিতেছি ইহা চোখে দেখিবার লোকের অভাব হইত না—হীরাপ্রভা এই রকমই বলিয়াছিল।

আমি উদ্ধার পাইবার জন্য টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম—কিন্তু হীরাপ্রভা কিছুতেই রাজি হয় নাই।

বিবাহ করিতেই হইল। আমি হিন্দুশাস্ত্র মানিয়া, অদৃষ্ট, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি যতই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ততই আমার আত্মীয়-স্বজনেরা আমাকে যবন বলিয়া গাল পাড়িতেছেন। আমি শাস্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—জন্মজন্ম ধরিয়া শ্রীমতী নীরপ্রভাই আমার স্ত্রীরূপে আমার ঘর আলো করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার তিন পুরুষের নাপিত আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই বিবাহের মধ্যে যে ব্যবসাদারিটুকু আছে সেটা নিশ্চিতই কালক্রমে আমরা উভয়েই ভুলিয়া যাইব, কেননা পণ লইয়া যাহারা বিবাহ করে তাহারাও ভোলে।

সুতরাং আমি যদি আশা করি, এই নীরপ্রভা আমাকে একান্ত মনে সেবা করিবে, ভক্তি করিবে এবং তাহার পাতিব্রত্যের নিষ্ঠা দ্বারা পরজন্মেও আমাকে পতিরূপে পাইবার চেষ্টা করিবে, তবে আমার বন্ধুদের হাসিয়া উঠিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখি না।

নবীনচন্দ্রের গঙ্গাযাত্রা

আমি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছি।—গল্প খুব বেশি লিখি না, কিন্তু গল্প লিখি। কাজেই নানা দিক হইতে নানা রকম তাগিদ মাঝে মাঝে আসিয়া পৌঁছে।

আমার এমন অভ্যাস যে একান্ত নির্জ্জন না হইলে কিছু লিখিতে পারি না। আবেষ্টনটি যতদূর সম্ভব নীরব এবং শান্ত হওয়া চাই। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে আমি মেসে থাকি, এবং পয়সার অভাবে এক ঘরে একা থাকি না।

আমার লিখিবার সময় রাত বারোটা। তার আগে সহবাসীদের ঘুম আসে না, এবং ঘুম আসিলে. ঘুমের চোখেই আলো নিবাইবার অনুরোধ আসে।

দিনের বেলা আমার ঘরের ভিতর হাট বসে। একজন স্বগৃহবাসী গোসাপের চামড়ার ব্যবসা করেন—বিস্তর চীনাম্যান সকাল সাড়ে সাতটায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

অন্য একজন ইনশিওর‍্যান্স কম্পানির কাজ করেন, সকালে উঠিয়াই তিনি অভ্যাগতদিগকে মর্টালিটি টেবল ও এক্সপেন্স রেশিও বোঝান।

তৃতীয় ব্যক্তিটি কেরানি, কিন্তু তিনি অবসর সময় সঙ্গীত চর্চ্চা করেন। কিছুদিন হইল মালকোষ রাগের উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া সময়ে অসময়ে তান ছাড়িতেছেন।

এদিকে ঘরে মশা এবং ছারপোকা আমার সর্ব্বনাশ করিবার উপক্রম করিয়াছে। বন্ধুরা যদি বা ঘুমান, ইহারা জাগিয়া বসিয়া থাকে। পৃথিবীতে লেখকের শত্রু চারিদিকে। এ রকম অবস্থায় কিছু লেখাই দায়।

সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতা শহরের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের খানিকটা অংশ মনে হইতেছিল যেন মরুভূমি।

নবীনচন্দ্র যুবক—কিন্তু একা চলিতেছে। কোনো গন্তব্য স্থান আছে বলিয়া বোধ হয় না, গতি উদাসীন।

নবীনচন্দ্র কলেজ ষ্ট্রীট অভিমুখে যাইতেছে, ঠিক তাহার বিপরীত দিক হইতে একটি নারীমূর্ত্তি তাহার দিকে আসিতেছে দেখা গেল।

আশেপাশে জনপ্রাণী নাই।

নারী যখন নবীনচন্দ্র হইতে তিন হাত দূরত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন নবীনচন্দ্র তাহার সম্মুখে হঠাৎ নতজানু হইয়া বসিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল, হে রমণী, তোমার জন্য আমি জন্মজন্ম জীবনপথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছি এবং আমার বিশ্বাস তুমিও আমার জন্য সেইরূপই করিতেছ। আকাশে অনন্ত কোটি সূর্য্য এবং পৃথিবী, মাটিতে অনন্ত কোটি জীব—

দেখুন ত মহাশয়, ঠিক এই সময় আমাকে কম করিয়াও পাঁচটি ছারপোকা কামড়াইতেছে, ইহাতে বাক্যের পারম্পর্য্য ঠিক রাখি কি করিয়া?

নবীনচন্দ্র "অনন্ত কোটি জীব" এই কথাটার পরে নিশ্চয়ই খুব চমৎকার কতকগুলি কথা বলিয়াছিল, কিন্তু ছারপোকা মারিতে গিয়া আমার সব ভুল হইয়া গেল, এখন শত চেষ্টাতেও আর মনে আসিবে না।

নারী যাহা বলিয়াছিল তাহা স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু শুনিলে হঠাৎ মনে হইবে নবীনচন্দ্রের কথার সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। ইহা নারীর অপরাধ নহে, অপরাধ আমার। আমার দুরবস্থাকেও দায়ী করিতে পারেন।

নারী বলিল, হে পুরুষ, তোমার কথা আমি বুঝিয়াছি। তুমি আমার ভিতরে বিশ্বনারীকে খুঁজিতেছ, খুঁজিতেছ, খুঁজিতেছ।

তাহার উক্তি হঠাৎ এরূপ উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইল কেন সে কৈফিয়ৎ দিতেছি।

সে ঠিক ঐ ভাবে বলে নাই। কাল যখন লিখিতে বসি তখন নানা কারণে রাত্রি একটু বেশি হইয়া পড়িয়াছিল। আমার চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছিল, সেই অবস্থায় একই কথা আমি বারবার লিখিয়া গভীর ঘুমে মগ্ন হইয়া পড়ি।

আসলে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা এই যে সে নবীনচন্দ্রের আবেগ এবং আবেদনের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে। সে বলিল, তোমাদের মুখে এমন কথা শুনিলে অহঙ্কার হয়, কিন্তু তোমার কথা ঠিক নহে।

নবীনচন্দ্র চট করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, কেন নারী, আমার ত ধারণা আমি ঠিক বলিতেছি।

নারী আবার কহিল, তোমার ধারণা ঠিক নহে।

নবীনচন্দ্র কহিল, তবে বুঝাইয়া দাও।

নারী মুখ ফিরাইয়া কহিল, দিব না।

কেন দিবে না ?

অপরাধ করিয়াছ।

আমি পুরুষ,—নারীর কাছে অপরাধ ?

হঠাৎ নবীনচন্দ্রের মধ্যে পুরুষত্ব-বোধ জাগিয়া উঠিল। সে বলিল, সময়ে অসময়ে নারীর পদতলে লুটাই সেইটি আমাদের দোষ, কিন্তু তাহাদের লইয়া যাহা খুশী ত করিয়া আসিতেছি।

নারী কহিল, সে কথা ঠিক—কিন্তু নতজানু অবস্থায় ছিলে, বেশ ছিলে, দাঁড়াইয়া উঠিয়া অপরাধ করিয়াছ। পুনরায় নতজানু হও—সব বুঝাইয়া দিতেছি।

নবীনচন্দ্র ফস করিয়া নতজানু হইল। নারী কহিতে লাগিল,

হে পুরুষ, তুমি যে বলিয়াছ তুমি আমার ভিতরে বিশ্বনারীকে খুঁজিতেছ ইহা কেন ঠিক নহে তাহা বলিতেছি।

দীন তারিণী তারা—

ঐ দেখুন, কেরানিবাবুটি, এখন রাত একটা এই সময় স্বপ্নে গান গাহিয়া উঠিলেন। আমি কলম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া হাসিতেছি।

আমার চিন্তাধারা ওলটপালট হইয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একান্ত নির্জ্জন না হইলে আমি লিখিতে পারি না। কিন্তু পাঠকপাঠিকা, এ কথা আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে উহাদের কি কথা হইয়াছিল না হইয়াছিল তাহা জানিয়া আপনাদের লাভ কি? উহাদের কথা ঠিকভাবে জানিতে পারিলেই কি কালকের বাজার খরচ জুটিবে? দুই দিন পরে এ মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হইবে, অফিস হইতে মাহিনা পাওয়া যাইবে, একবার ভাবিয়া দেখুন ত, কয়টি পয়সা তাহা হইতে বাঁচিবে? এই ত বাঙালীর জীবন—কেবল খাটিয়া মরা! ঘরে এতটুকু আনন্দ নাই, শান্তি নাই, কিছুই নাই। চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী সকলেরই এক অবস্থা। এইসব চিন্তা করিলে কি গল্প শুনিবার প্রবৃত্তি থাকে?

নারী খুব-সম্ভব কহিয়াছিল, আমরাই চিরকাল অভিসার করিয়াছি, আমরাই পুরুষকে খুঁজিয়াছি, আর হালে আমাদের পিতা আমাদের হইয়া বর খুঁজিয়া দিতেছেন। তোমরা যদি নারীকে খুঁজিতে তাহা হইলে—

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার বিবাহ হইয়াছে?

নবীনচন্দ্র বলিল, না। একটি সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে।

কেন?

বাবার দাবী ছিল বেশি, ক'নের পিতার অবস্থা ভাল ছিল না।

তবেই দেখ, তোমরা যদি নারীকে খুঁজিতে তাহা হইলে পণপ্রথা উঠিয়া যাইত।

নবীনচন্দ্র বলিল, আমার বাবার কথা ছাড়িয়া দাও। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নারীকে পূজা করি—প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এক পয়সা না লইয়া, বরঞ্চ ঘর হইতে কিছু খরচ করিয়া বিবাহ করিব।

পিতার সঙ্গে ঝগড়া করিবে?

কিছু দরকার হইবে না—তিনি গত বৎসর মারা গিয়াছেন।

নারী মৃদু হাসিয়া নবীনচন্দ্রকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল এবং বলিল, আমার সঙ্গে চল।

নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়? তারপর হঠাৎ বলিল, না না, আমি জিজ্ঞাসা করিব না কোথায়, তোমার সঙ্গে যেখানে হয় যাইব, এমনকি স্বর্গেও।

নারী কহিল, "এমন কি" কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না—"স্বর্গ" ত লোকের কাম্য!

নবীনচন্দ্র কহিল, "স্বর্গ" কথাটা "যাওয়া" ক্রিয়ার কর্ম্ম হিসাবে ব্যবহার করা সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের একটি দোষ ছিল। আমরা বরাবর মরিয়া যাওয়াকেই স্বর্গে যাওয়া বলি। পরিবারের আরো কতকগুলি দোষ ছিল, তাহা আমি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি।

নারী বলিল, আহিরীটোলা ঘাটে গিয়া নৌকা ভাড়া করিব, আমার সঙ্গে চল।

নবীনচন্দ্র বলিল, চল, এই যে ট্যাক্সি।

উহারা ট্যাক্সিতে চলিয়া যাইবার পর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আবার লোক চলাচল আরম্ভ হইল।

নারী নৌকায় বসিয়া কহিল, তোমার সঙ্গে কেমন চালাকি করিলাম!

নবীনচন্দ্র দমিয়া গিয়া নারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নারী কহিল, তোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছি, তুমি কিছুই টের পাইতেছ না।

নবীনচন্দ্র সহসা বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিল, বল কি নারী, তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ?

নারী কহিল, না।

নবীনচন্দ্র আবার দমিয়া গেল।

নারী কহিল, এতক্ষণও বুঝিতে পার নাই?

নবীনচন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিল, আমিই তোমাকে আগে ভালবাসিয়াছি।

নারী জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম ভালবাসিয়াছ, আমাকে বল।

নবীনচন্দ্র আবেগভরে বলিয়া উঠিল, ও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে পাগল করিও না। আমার চিরজীবনের প্রেম আমার ভাবুকতার মধ্যে আবদ্ধ আছে, প্রকাশ করিতে গেলে তাহার শেষ পাই না, মনে হয় অনন্তকাল বকিতে থাকি। আমি তোমাকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসিয়াছি—বিশেষত তোমার কাছে প্রশ্রয় পাইবার পর হইতে আমি মরিয়াছি। নৌকা ভাসিতেছে কিন্তু আমি ডুবিলাম, আমাকে উদ্ধার করে কাহার সাধ্য? হে জন্মজন্মান্তরের

প্রেয়সী, তোমার আমার আজিকার এই মিলন কি আকস্মিক, কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব্ব !

আমি আজও বাঁচিয়া আছি, কিন্তু এখন মনে হইতেছে তোমাকে না দেখিলে আর বাঁচিব না। তুমি আমার প্রাণকে মনকে কি অপূর্ব্ব রসে পুলকিত করিয়া তুলিয়াছ। এই রসের সমুদ্রে যত ডুবিতেছি ততই মনে হইতেছে ইহার শেষ নাই।

হে প্রিয়তমা, হে সখী, তুমি ক্যান্সার রোগের কারণ জান ? না যদি জান তবে লজ্জিত হইবার কারণ নাই, কেননা আমি নিজেও ভাল করিয়া জানি না। আমাদের দেহ অগণিত 'সেল' দ্বারা তৈরী। শুনিয়াছি, বলা নাই কহা নাই কোথা হইতে একটি 'সেল' নিজেকে অসংখ্য 'সেলে' বৃদ্ধি করিতে থাকে—অকারণে এবং অপ্রত্যাশিত রূপে। ইহাকেই লোকে বলে ক্যানসার।

তোমার সংস্পর্শে আসিয়া আমার ভালবাসার একটি 'সেল' তেমনি নিজেকে দ্রুতবেগে বাড়াইয়া তুলিতেছে। আমার মনে ক্যানসার ধরিয়াছে, আমি বেশ বুঝিতেছি এই ভালবাসা আমাকে শেষ করিবে।

হে প্রেয়সী, তুমি কি বিসর্জ্জন পড়িয়াছ ? গোবিন্দমাণিক্য গুণবতীকে বলিয়াছিলেন, 'কর্ত্তব্য কঠোর হয় তোমরা ফিরালে মুখ।'

আশা করি বুঝিয়াছ কথাটা মোটেই ঠিক নয়। তোমরা প্রসন্ন মুখে চাহিলেই কর্ত্তব্য-বোধ নষ্ট হয়—মনে হয়, সমাজ-সংসার সব মিথ্যা, কেবল ঐ মুখখানাই সত্য। যাঁহারা কর্ত্তব্যসাধনেই জীবন শেষ করিতে চাহিয়াছেন, স্ত্রীলোকের মুখদর্শন তাঁহাদের শাস্ত্রে নিষেধ।

কিন্তু হে প্রিয়তমা, আর চাপিয়া বলিতে পারিতেছি না, হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ ঝড়ের মত বাহিরে আসিতে চাহিতেছে, এখনি যত কথা আছে সব এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলি। এখানে অন্য কেহ উপস্থিত

নাই, থাকিলে মনে করিত থিয়েটার করিতেছি, কিন্তু আমি জানি তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে না।

কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

বলিয়াই নবীনচন্দ্র খপ করিয়া নারীর হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা ?

নারী কহিল, আমরা কায়স্থ।

নবীনচন্দ্র ভীষণ বেগে চমকিয়া বলিয়া উঠিল, বল কি নারী, আমি যে ব্রাহ্মণ! একথা আগে জানি নাই কেন ? আমার সব গেল— হায় এ জীবনে কিছুই ধরা গেল না। বলিয়াই—

নবীনচন্দ্র নৌকা হইতে ঝাঁপ দিয়া গঙ্গার মধ্যে পড়িল। নারী চীৎকার করিয়া বলিল, মূর্খ, তোমার এত কুসংস্কার—তুমি বিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়া—তুমি হতভাগা—

বলিতে বলিতে নারী কাঁদিয়া ফেলিল।

নবীনচন্দ্র সাঁতার দিতে দিতে কহিল, কি করিব, আমাদের বংশের দোষ, আমি কন্‌জারভেটিবের সন্তান—আমার রক্তের মধ্যে গোঁড়ামি,—তুমি আর আমাকে ডাকিও না।

বলিতে বলিতে নবীনচন্দ্র স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া দিল।

নারীর চোখ অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে—নবীনচন্দ্রের ভাসমান দেহ তাহার আর দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু একটি কীর্ত্তনের সুর তাহার কানে পৌছিল, 'সখী ডুবিলাম, ডুবিলাম'।

লোক-রহস্য

পৃথিবীতে যত লোক, তত দৃষ্টি, তত বোধশক্তি, এবং তত বিচার-শক্তির বৈচিত্র্য। তবু কেহ যখন বলে, মহাশয়, আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম, আমার কথা মিথ্যা? আমি নিজ কানে শুনিলাম, তবু বিশ্বাস হয় না? তখন তাহাকে না মানিয়া উপায় নাই। বিশ্বাস না হইলেও মানিতে হয়, কারণ মানুষের চক্ষুলজ্জা প্রবল।

কিন্তু বিজ্ঞানের চক্ষুলজ্জা নাই। সে মানুষের প্রত্যক্ষদর্শনকে বিশ্বাস করে না, মানেও না। তাহার ভরসা যন্ত্র-দর্শনের উপর। কারণ যন্ত্রকে মধ্যস্থ মানিলে মতবিরোধ ঘুচিয়া যায়।

একই জলে হাত ডুবাইয়া আমি বলিতেছি ঠাণ্ডা, আর একজন বলিতেছেন ঠাণ্ডা নয়; অথচ দুই জনেই স্বীকার করিতেছি জলের উত্তাপ ৬৫ ডিগ্রী। ডিগ্রীর মাপ, যন্ত্রের মাপ,—ইহার সঙ্গে আইন-ষ্টাইন ছাড়া আর কাহারো বিরোধ নাই।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বেলায় আমাদের পরস্পর অবিশ্বাস। কিন্তু ভূত আমরা কেহ প্রত্যক্ষ করি নাই বলিয়া ভূত সম্বন্ধে কাহারো অবিশ্বাস নাই। প্রত্যক্ষদর্শন বিশ্বাস করি না, মানি; এবং অপ্রত্যক্ষ-দর্শনকে মানি না, বিশ্বাস করি। দুইটির মধ্যে ইহাই পার্থক্য।

কিন্তু অবিশ্বাস যেখানেই থাক, মানুষের কোথাও যেন একটা নির্ভরতা আছে। জগতের সমস্তই মায়া বলিয়া প্রচার করিয়াও সে যথারীতি মামলা-মোকদ্দমা করিতেছে, এবং সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত খোল-করতাল লইয়া কীর্ত্তন গাহিতেছে; জীবনটাকে উপভোগ করিতে কোথাও আটকাইতেছে না।

এই বৈজ্ঞানিক যুগেও এরূপ অসঙ্গতি টিকিয়া গেল ইহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু ইহার কারণ আছে। মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সে কোনো জিনিষের দুইটি দিক একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত তাহা হইলে তাহার সেই দ্বিদেশদর্শী অভিজ্ঞতাকেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা চলিত। জল একই সঙ্গে গরম এবং গরম নহে, পৃথিবী একই সঙ্গে চলিতেছে এবং চুপ করিয়া আছে, এই দুইটি দিক লোকে এক সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই গোলমাল। কিন্তু না পারিয়াই বা কতকাল চলিবে ?

এই সব তত্ত্বকথা আজ মনের মধ্যে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। তাহার কারণও আছে। আমার সম্বন্ধে প্রচার, আমি বাজারে এত দেনা করিয়াছি যে, লোকের সামনে উন্মুক্ত মুখে চলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। গত বৎসর শ্রাবণ মাসে আমি একটি বড় কাপড়ের দোকান হইতে প্রায় একশত টাকার শাড়ী ধারে কিনিয়াছি। শীতকালে জনৈক কাবুলি-ওয়ালার নিকট হইতে আমি একজোড়া অতি উৎকৃষ্ট আলোয়ান লইয়া নগদ দাম দেই নাই। আমি বিবাহ করি নাই, অথচ একশত টাকার শাড়ী কিনিলাম কেন,—ইহাও লোকে আলোচনা করিয়াছে। আমার সংসারে কেহই নাই, অথচ কলিকাতা শহরে আমার আত্মীয়েরও অভাব নাই, এ কথা আমি প্রচার করিয়া থাকি। ইহাতে লোকে সন্দেহ করে। আমি গত গ্রীষ্মের ছুটিতে পশ্চিম ভ্রমণে গিয়াছিলাম, সেজন্য আমার এক আত্মীয়ের নিকট হইতে দুইশত টাকা ধার লইতে হইয়াছিল, এ কথা আমার বন্ধুগণ সকলেই অবগত আছেন। আমি লোকের সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা না করিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া থাকি। ঘরে একটি ছোটখাটো লাইব্রেরি করিয়াছি, বই পড়িয়াই অনেক সময় কাটাইয়া দেই। অনেকে বই চাহিতে আসে, কাহাকেও কোনো বই দেই না।

পূর্ব্বে একমাসে আলমারি খালি হইয়া গিয়াছিল, নূতন করিয়া বই কিনিয়া তাহা পূরণ করিয়াছি। আমার বই যে আমারও মাঝে মাঝে প্রয়োজন হইতে পারে, গ্রহণকারী তাহা ভুলিয়া যায়। এই উপলক্ষে একদল পড়ুয়া বন্ধু আমার উপর চটিয়া আছে।

আমি যাহাদের সঙ্গে মিশিয়াছি তাহারা সকলেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমার গতিবিধি তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কোথায় আমার কত দেনা তা তাহারা জানে। আমার সম্বন্ধে তাহারা যখন-তখন যেখানে-সেখানে আলোচনা করে। আমি ক্রমেই বন্ধুদের নিকট বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছি। তাহারা আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যটি ধরিয়া ফেলিয়াছে। কাহারো সঙ্গে দেখা হইলেই আমি টাকা ধার চাহি এবং আজ পর্য্যন্ত কাহারো সম্পর্কেই এবিষয়ে অন্যথা করি নাই। ধার করিয়াই আমার জীবন আরম্ভ হইয়াছে, এবং ধার করিতে করিতেই আমার মৃত্যু হইবে। আমার উপার্জ্জন অতি সামান্য এবং সে তুলনায় ঋণের পরিমান অনেক বেশি। বন্ধুদের আমার বিষয়ে সতর্ক হইবার সময় আসিয়াছে। আমি জীবনে যাহা পরিশোধ করিতে পারিব না, অম্লান বদনে সরল লোকদিগকে ঠকাইয়া তাহা গ্রহণ করিতেছি। দরিদ্র হইলেও আমার দাম্ভিকতার সীমা নাই। আমি তিনটি স্কুলের ছেলেকে পড়িবার খরচ দিতেছি। পূর্ব্বে বিলাতি 'হাইওয়েম্যান'দের কাহারো কাহারো এইরূপ মহানুভবতা ছিল বলিয়া শুনা যায়। আমি তাহাদেরই সগোত্র, কেবল ভারতীয় বলিয়া আমার সাহস নাই। সুতরাং ডাকাতি না করিয়া ভিক্ষা করি এবং লোককে প্রতারণা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করি। আমার একমাত্র গুণ, আমার চেহারা ভাল এবং কথা বলিবার ভঙ্গি মনোমুগ্ধকর। কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করি, "কি হে, কেমন আছ?" সে তৎক্ষণাৎ বলে, "আরে ভাই, বড় অর্থকষ্টে পড়িয়াছি।" অর্থাৎ

পাছে আমি টাকা চাহিয়া বসি, সেই ভয়ে আগেই নিজের দুরবস্থার সংবাদ দেয়।

কেহ কেহ আমার কল্যাণ-কামনায় উপদেশ দিয়া থাকে। বলে, "দেনা করায় বড় বিপদ হে, শেষে শোধ দিতে মুস্কিল বাধিবে।" আমি চুপ করিয়া থাকি ; তাহাতে তাহারা আমার উপর আরো বিরক্ত হয়। আমাকে মনে মনে কেহ ঘৃণা করে, কেহ বা ভয় করিয়া চলে।

কিছুদিন পূর্ব্বে "বাঙালীর ব্যবসা" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া একটি সাময়িক পত্রিকায় ছাপাইয়াছিলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম—"বাঙালীর ব্যবসা বেশিদিন টেঁকে না কেননা বন্ধুগণ ধারে জিনিষ লইতে আরম্ভ করে এবং সে ধার কখনো শোধ করে না। বন্ধুর দোকান হইতে ধারে ক্রয় করা তাহারা জন্মগত অধিকার বলিয়া বিবেচনা করে। তাহারা দায়ে পড়িয়া যে এরূপ করে তাহা নহে, বন্ধু বলিয়াই করে। এরূপ বন্ধুপ্রীতির উচ্ছেদ কামনা করি।"

আমার বিশ্বাস, লেখাটি বেশ জোরালো হইয়াছিল। যাহারা পড়িয়াছিল, তাহারাও কেহ অন্যরূপ বলে নাই। একখানি কাগজে লেখাটির একটি সমালোচনা বাহির হয়। কিন্তু সমালোচনাটি আমার প্রবন্ধের বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। সমালোচক আমার লেখা ছাড়িয়া আমাকে লইয়া রসিকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল এই যে, যে লোক নিজে দেনায় ডুবিয়া আছে তাহার পক্ষে "বাঙালীর ব্যবসা"-জাতীয় প্রবন্ধ লিখিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর কি আছে ? মাতাল মদের বিরুদ্ধে বলিবে, গঞ্জিকাসেবী গাঁজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিবে, ইহাই আজকালকার দস্তুর !

এই সমালোচনার একটি প্রতিবাদ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমি লিখিতেছিলাম—মদ কিংবা গাঁজার বিরুদ্ধে যদি কাহারো কিছু

বলিবার অধিকার থাকে তবে তাহা একমাত্র মাতাল কিংবা গঞ্জিকা-সেবীরই আছে। যাহার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা সে বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার তাহারই। কিন্তু লোকে অভিজ্ঞতাকে বিশ্বাস করে না। যাহা হউক, লেখাটি আরম্ভ করিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। জনমত আমার ব্যক্তিগত রীতিনীতির বিরুদ্ধে, যাহার যাহা ইচ্ছা করুক।

আমাকে কেহই কিছু বলিতে দিল না। লোকে জানিল আমি ঋণ-গ্রহণ ব্যাপারটা একটা আর্ট হিসাবে চর্চ্চা করিতেছি। তাহারা জানিল, আমি লোক ঠকাইবার নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কারে নিযুক্ত রহিয়াছি। তাহারা সবই জানিল, শুধু এইটুকু জানিল না যে আমি বহু পূর্ব্বেই আমার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া ফেলিয়াছি। কাপড়ের দোকানে, কাবুলিওয়ালার কাছে, কিংবা বন্ধুদের কাছে কাহারো নিকট আধ-পয়সাও ধারি না। লোকে প্রত্যক্ষ যাহা দেখিল তাহাই তাহাদের কাছে ধ্রুব সত্য,—প্রত্যক্ষের অতীত যে সত্য আমাকে ঋণমুক্ত করিয়াছে তাহা দেখিবার চেষ্টাও করিল না।

এইরূপেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু আমার যথাসাধ্য সাবধানতা সত্ত্বেও একদিন কেমন করিয়া প্রকাশ হইয়া গেল যে আমি জমিদার-পুত্র। মফঃস্বলে আমার প্রকাণ্ড জমিদারি আছে। তখন হঠাৎ এই সব প্রচারকারীর দল একে একে আমার গা ঘেঁসিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার সঙ্গে সময়ে অসময়ে তাহাদের দেখা হইতে লাগিল এবং আমি যে যথার্থই মহৎ সে বিষয়ে তাহাদের আর সন্দেহ রহিল না। এমনকি তাহারা গোপনে গোপনে অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিল যে আমার কোথাও দেনা নাই। কলিকাতা শহরে আমার আত্মীয়স্বজনকেও তাহারা আবিষ্কার করিতে ত্রুটি করিল না। যে তারিখে একশত টাকার শাড়ী কিনিয়াছিলাম, তাহারা নিশ্চিত

বুঝিতে পারিল যে, ঐ তারিখে আমার এক মামাতো বোনের বিবাহ-উপলক্ষে আমি ঐ শাড়ী বোনকে উপহার দিবার জন্য কিনিয়াছিলাম।

এই সব বন্ধুদের সহৃদয়তায় আমার চা এবং চুরুটের খরচ কিছু বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল, কিন্তু এরূপ তুচ্ছ জিনিসে তাহারা আর দৃষ্টিপাত করিল না। যে কাগজ আমাকে গাল দিয়াছিল, সেই কাগজে সেই গাল দেওয়ার বিরুদ্ধে একটি বড় প্রতিবাদ ছাপা হইল। আমি যে সব যুক্তি দেখাইয়া নিজে প্রতিবাদটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেখিলাম প্রকাশিত প্রতিবাদটিতে তাহার চেয়েও ভাল ভাল যুক্তি রহিয়াছে। ইহার পরেই সেই কাগজের তরফ হইতে আমার নিকট লেখার তাগিদ আসিল। সম্পাদক লিখিলেন, ভ্রমক্রমে আপনার মূল্যবান প্রবন্ধটি লইয়া আমাদের কাগজে যে জঘন্য মন্তব্যটি বাহির হইয়াছিল এতদিনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলাম।

আমি হঠাৎ খরচের হাত গুটাইয়া লইলাম। বন্ধুগণ আবিষ্কার করিল আমার চরিত্রের ভিতর একটা দুর্ভেদ্য রহস্য রহিয়াছে। আমি আবার দেনা করিতে আরম্ভ করিলাম, বন্ধুগণ হাসিয়া হাসিয়া বলাবলি করিল, আমি নাকি অত্যন্ত খামখেয়ালি। আমার সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আমি অনেকগুলি দেনা নির্দ্দিষ্ট তারিখে শোধ দিতে পারিলাম না, ঋণদাতারা খুব খানিকটা ইয়ার্কি করিয়া চলিয়া গেল। একজন বলিল, "বড় হিসাবী হইয়া পড়িয়াছেন দেখিতেছি।" আর একজন বলিল, "ব্যাঙ্কে কত টাকা জমিল? ব্যাঙ্কের টাকায় হাত না দিয়া ধার করা ইহাও একটা খেয়াল।" তাহারা টাকা না পাইয়া মনে কিছুই করিল না। আমি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহারা এ সমস্তই আমার রসিকতা বলিয়া খুব আমোদ অনুভব করিতে লাগিল।

তাহারা জানিল আমি ধনী, আমি যাহা কিছু করি রসিকতা করিবার জন্য, যে-কোনো তুচ্ছ বিষয়ে গভীর রহস্য-সৃষ্টি করিবার জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাহারা জানিল, আমি জমিদার-পুত্র, এবং যত জানিল তত আমাকে স্নেহ করিতে লাগিল। তাহারা শুধু এইটুকু জানিল না যে আমার জমিদারি নিলাম হইয়া গিয়াছে, আমি যাহা কিছু করিতেছি অভাবের তাড়নায়, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া।

বর্ষা রাতে

অন্ধকার রাত্রি, তাহার উপর টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। চোখে কিছুই দেখা যায় না, তবু চলিতেছি। বাঁশ বন, আম বাগান, আশ-শ্যাওড়ার ঝোপ, বেতের ঝাড়, পথের দুই পাশে ঘনীভূত অন্ধকারকে আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। কিছু দূর যাইতেই হঠাৎ কি একটা জানোয়ার রাস্তার এধার হইতে ওধারে ছুটিয়া গেল।

ভয়ে সমস্ত গা কাঁপিতেছে, তাড়াতাড়ি পা ফেলিবার উপায় নাই, আছাড় খাইতে হইবে। ভগবান যখন বিপদে ফেলেন, তখন দেশলাই থাকিলেও জ্বলে না, বৃষ্টিতে ভিজিয়া যায়। সেই জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস—কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আমি নাস্তিক, আমি অলিভার লজ্‌কে বিশ্বাস করি না, আনি বেসান্তের বিরুদ্ধে মন্তব্য করি, কিন্তু আমার এ কি হইল!

দেখিলাম আমার বুদ্ধি যুক্তি দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছে, তাহা আমার

মন অগ্রাহ্য করিয়া ভূতকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। ফলে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে এবং ঘাম হইতেছে।

এ রকম কেন হয়, কিছুই বুঝি না। আমি স্কুল মাষ্টার,—আজকেই বেলা তিনটার সময় একটি ছাত্রকে পড়া না বুঝিবার অপরাধে প্রহার করিয়াছি। এখন ভাবিতেছি, আমি নিজেকেই নিজে বুঝাইতে পারি না—ছাত্র ত ছেলেমানুষ! ঠিক করিলাম, আজকের মত যদি বাঁচিয়া যাই তবে ভবিষ্যতে—কিন্তু কোনো বিষয়েই ত প্রতিজ্ঞা করা ভাল নয়!

এই অন্ধকার দুর্য্যোগের রাত্রি, মনে পড়িল রাধিকার অভিসারের কথা। আচ্ছা সে যুগে কি ভূত ছিল না? যদি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কিংবা শ্রীযুক্তা রাধিকা দেবতা হন তবে অবশ্য ভূতের ভয় তাঁহাদের না থাকিবার কথা। কিন্তু আমি জানি তাঁহারা—কিন্তু এ কথাও থাক।

জঙলা পথ ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। এখানে অন্ধকার কিছু কম, কিন্তু পথ আরও ভয়ানক। ইহা পথই নহে। দুই ধারে পাটের ক্ষেত, তাহারি মধ্যে সরু ভাঙা-চোরা আল, এবং তাহার উপরে বড় বড় ঘাস। প্রতিপদে আছাড় খাইতেছি।

কিন্তু আমাকে যে চলিতেই হইবে! তিন দিন না খাইয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আজ রাত্রের চলা আমি বন্ধ করিতে পারি না। আমি কেন চলিতেছি? কেন চলিতেছি—কিন্তু সে কথা এখন থাক।

হায়, এ আমার অদৃষ্ট! আমি অদৃষ্টবাদী নই। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাসে এবং সংস্কারের ফলে 'অদৃষ্ট', 'ভাগ্য' প্রভৃতি কথাগুলি মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। অদৃষ্টবাদ এবং স্বাধীন-ইচ্ছা সম্বন্ধে যে দার্শনিক মতবাদ—কিন্তু এ কথাও থাক।

আমি কেন চলিতেছি? যাঁহারা ঘোর সাংসারিক নহেন, যাঁহারা

সন্ধ্যায় সোনালী মেঘের দিকে চাহিয়া সুখ পান, দক্ষিণ সমীরণে যাঁহাদের মন চঞ্চল হয়, জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া ঘুমন্ত প্রেয়সীর মুখের উপর পড়িয়াছে এমন দৃশ্য দেখিয়া যিনি সংসার ভুলিয়া যান, যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদের অনেককেই এই রকম চলিতে হয়। দুঃখের বিষয় আমিও তাঁহাদেরই একজন, কাজেই চলিতে হইতেছে।

ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখিতেছিলাম না, কিন্তু মাঠের মাঝখানে আসিয়া ঝাপসা দৃষ্টিতে বিপদ বাড়িল। হঠাৎ দেখিলাম, দূরে কি যেন একটা বসিয়া আছে। সমস্ত দেহ ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। ক্রমে তাহার চোখ দুইটি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মুখ খুলিয়া গেল, তাহার ভিতর আগুনের মত কি যেন একটা জ্বলিয়া উঠিল। নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না, কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলাম। ঠিক এই মুহূর্ত্তে কানে আসিল মানুষের গলার আওয়াজ। সেই নির্জ্জন প্রান্তরে, গভীর অন্ধকারে যে ভূতের হাট বসিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তে তাহা অন্তর্হিত হইল; আনন্দে চীৎকার করিতে গেলাম, কিন্তু গলায় শব্দ বাহির হইল না। উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, ভাঙা শামুকে হাত অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে; স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

যথাসাধ্য পা টিপিয়া টিপিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্বে যেটাকে অপার্থিব ভৌতিক একটা কিছু মনে করিয়াছিলাম সেটা পার্থিব একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি। তাহার পাশে সামান্য একটু ঝোপ এবং তাহার আড়ালে কয়েকজন লোক কথা কহিতেছে। আরো একটু কাছে যাইতেই বুঝিলাম তাহা সাধারণ কথা নহে, ঝগড়া। লুকাইয়া কিছু শুনিবার লোভ হইল। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ইহারা চোর, এইমাত্র গ্রাম হইতে চুরি করিয়া আনিয়া এখানে মালের বখরা করিতেছে।

সমস্ত শুনিয়া জানা গেল, বাক্সে নগদ টাকা এবং কিছু অলঙ্কার পাইয়াছে। জামা-কাপড়ও পাইয়াছে। কিন্তু সেগুলি ফেলিয়া যাইবে, লইবে না।

আড়ালেই লুকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা চলিয়া গেল। আমি তখন ভাঙা বাক্সটির কাছে গিয়া বসিলাম। বাক্সটি খোলা পড়িয়া আছে, কাপড়গুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। একটা সিঁদূরের কৌটা, কয়েকখানা বই, ছোট বড় কয়েকটা শিশি—বোধ হয় এসেন্স তেল ইত্যাদি হইবে। অনেকগুলি চিঠি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি সব বিস্মৃত হইয়া কাপড়, জামা, চিঠিপত্র যাহা হাতে পাইলাম বাক্সে তুলিলাম। পাশেই একটুকরা কাপড় পড়িয়াছিল, হাতে লইয়া দেখিলাম সেটা একটা সিল্কের ব্লাউজ।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল মেয়েদের লোলুপতার কথা। পোযাক চাই, অলঙ্কার চাই করিয়া কত স্ত্রী গরিব স্বামীদিগকে দিক্ করিয়া মারে। শেষটায় স্বামী প্রাণপণ করিয়া যেদিন গহনা গড়াইয়া আনে, সেই রাত্রিতেই চোর আসিয়া হানা দেয়।

কিন্তু আমার বাড়ীর পাশে রাইচরণ মালীর বৌকেও ত দেখিয়াছি। সে কতদিন নিজে না খাইয়া স্বামীকে খাওয়াইয়াছে। রাইচরণ একবার পূজার মধ্যে স্ত্রীর জন্য ফুলপাড় শাড়ী কিনিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী তাহা লইয়া অনর্থক এত গণ্ডগোল করে, যাহার ফলে রাইচরণ সে কাপড় ফিরাইয়া দিয়া আসিতে বাধ্য হয়। শ্যামাসুন্দরী বলে, 'আমার বিবি সাজিয়া কাজ নাই—সোয়ামী যদি বাঁচিয়া থাকে তাহাতেই আমি সুখী।'

শ্যামাসুন্দরীর পরেই মনে পড়িল বার্ণার্ডশ'এর কথা। মেয়েরা প্রকৃতির গুপ্তচর—ওরা কৃপার পাত্রী। উহাদিগকে পাইয়া কেহ সুখী

হয় না। রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত খানিকটা সায় দিয়া বলিয়াছেন, বিচ্ছেদ যেখানে নাই সেখানেও বিচ্ছেদ কল্পনা না করিলে পুরুষ বাঁচে না। —তা না বাঁচুক, কিন্তু ঐ যে দূর দিয়া রেল-লাইন গিয়াছে উহারি উপরে সেদিন শ্রীমতী রাধারাণীর দেহ এঞ্জিনের নীচে নিষ্পেষিত হইল কেন? এ সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলিবার আছে। ওঃ কি বীভৎস সে দৃশ্য! মাথাটা ফাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, মগজ দেখা যাইতেছে—একখানা হাত কাটিয়া দশহাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে—দেহটাকে শেয়ালে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

মনে করিতেই সমস্ত দেহ-মন আবার শিহরিয়া উঠিল। আর একটু হইলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িতাম, কিন্তু জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এ রকম অবস্থাতেও বাক্সটি ঘাড়ে তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাত চলিল না।

খালি হাতে দৌড়াইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দৌড়ানও গেল না, ভয়ে পা ভারি হইয়া উঠিয়াছে—পূরা পনের মিনিট অর্দ্ধদৌড় অবস্থায় ছুটিবার পর হাঁফাইতে হাঁফাইতে যে-গৃহে পৌঁছিলাম—সেটা দেখিলাম আমারি গৃহ। পা দুইটি আমাকে ঠিক বহন করিয়া আনিয়াছে।

দরজায় কড়া নাই, হাত দিয়া আঘাত করিতে লাগিলাম। স্ত্রী ঘুম হইতে জাগিয়া ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে, কে ও বাইরে?" আমি সাড়া দিয়া বলিলাম, "ভয় নাই দরজা খোল—একটু শীগ্‌গির।" দরজা খুলিয়াই স্ত্রী মূর্ত্তিমতী প্রশ্ন হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কিন্তু এরূপ অবস্থায় কেন ফিরিলাম তাহার কি উত্তর দিব? বলিবার মত মনের অবস্থা নহে।

কিন্তু তাহাকে যে বলিতেই হইবে আমি কেন ফিরিলাম। কেনই বা বলিব না? সে আমার স্ত্রী, আমি তাহার স্বামী—তিন বৎসর

হইল আমাদের বিবাহ হইয়াছে। ইহার মধ্যে কত বিষয়ে উভয়ে উভয়ের কাছে ঋণী হইয়া আছি, বাধ্যবাধকতা দ্বারা বেশ একটি মোলায়েম আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাকে কি নষ্ট করিতে পারি ?

কিন্তু ইহাও ঠিক যে এ আত্মীয়তার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। ইহা নিতান্তই একটা গরজের ব্যাপার। একটা মস্ত বড় সংস্কার—বহুদিনের জীর্ণ প্রাচীন সংস্কার। সেদিন সিনেমাতেও দেখিলাম—কিন্তু এ কথাও থাক। আর থাকিয়াই বা লাভ কি ?—পরে কি আর বলিবার সময় হইবে !—কিন্তু তবু থাক।

আমি ফিরিয়া আসিলাম কেন, স্ত্রীকে বলিতেই হইল। কিন্তু এ কথা অন্য কেহ শুনিলে স্ত্রীর বড় লজ্জা হইবে, সেইজন্য তাহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি কাহাকেও বলিব না।

এই ভাবেই ত ছিলাম, এখন দেখি স্ত্রী নিজেই কথাটা ফাঁস করিয়া দিয়াছে।

অথচ কথাটা আমি নিজেই বলিতে পারিতাম, দেখিতেও ভাল হইত। আমি কি এমন অন্যায় করিয়াছি যে, তাহা আর কেহ শুনিলে স্ত্রীর লজ্জা হইত ? শিক্ষক-সম্মিলনীতে যাইবার শেষ গাড়ীখানা ধরিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়া দেখি মানিব্যাগটি ভুল করিয়া আনি নাই,—এই সামান্য কথাটি আমার স্ত্রী গোপন রাখিতে পারিল না ! হায় স্ত্রী !

অচল

'হৃতশক্তি'র গ্রাহক হইলে নবীন লেখকের লেখা সংশোধন পূর্ব্বক ছাপা হয়। সংবাদ পাইবামাত্র একটি গল্প ও দুইটি টাকা লইয়া সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিলাম।

আমি সুরেন ভট্টাচার্য্যকে হার মানাইয়া এ পর্য্যন্ত প্রায় ষাটখানা নভেল লিখিয়াছি। তথাপি শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ তলাপাত্রের নাম যে সাহিত্য-জগতে অপরিচিত, তাহার অন্য কারণ আছে। তাহা এই যে, আমার লেখা কেহ ছাপে না। আমি নিজে ছাপাইতে পারিতাম, কিন্তু টাকা নাই।

সম্প্রতি আমি নভেল লেখা ছাড়িয়া ছোট গল্পের মধ্যে আমার উচ্চাশাকে বন্দী করিয়াছি; ঠিক করিয়াছি, এক বৎসর দমিব না এবং আমার পরম বন্ধুরাও যদি আমার সম্বন্ধে আশা ত্যাগ করেন, আমি করিব না।

'হৃতশক্তি'র সম্পাদকের কাছে আমার গল্পটি পড়িতেছি।—

কানু আর রাণু, সখা এবং সখী। বয়স সাত এবং পাঁচ।

কানুর অভিভাবক মাসী।—রাণুর, বাবা, মা এবং মামা।

বারো বৎসরের পরের ঘটনা।

কানু, কানাইলাল রায়, থার্ড ইয়ার।

রাণু, রাণী মুখোপাধ্যায়, ফার্ষ্ট ইয়ার।

কানুর পিতা উদার, মাতার নিজস্ব কোনো মত নাই, মামা গোঁড়া এবং রাণুর কলেজে পড়ার বিরোধী।

কানু-রাণুর কল্পনা করিবার বয়স।

কানু মনটাকে বেলুনের মত আকাশে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকে, বেলুন নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে উড়িয়া বেড়ায়। সঙ্গে থাকে রাণু।

সম্পাদক মহাশয় তাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া থাকে?

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, ইচ্ছা থাকিলে কিছুই আটকায় না।

কানু বলে, আমরা দুঃখের মাটিকে কখনো স্পর্শ করিব না।

রাণু বলে, নীড় বাঁধিতেও একটা আশ্রয় চাই, মাটি না হউক গাছ দরকার।

কানু বলে, আমরা গাছেই থাকিব। তুমি হইবে বনদেবী, আমি হইব কাঠুরিয়া। তুমি বন আলো করিয়া থাকিবে, আমি সেই আলোয় কাঠ কাটিব। তুমি দিবে কর্ম্মের প্রেরণা, আমার মন অসীম শূন্যে কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিতে বাহির হইবে।

কানু রাণুকে চিঠি লেখে,—আমরা বাল্যকাল হইতে পাশাপাশি এক পথে যাত্রা করিয়াছি, আমরা একই পথে অবশ্য অবশ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাইব, ইহার কোনো অন্যথা হইবে না।

রাণু লেখে,—যে পথে মাটির স্পর্শ লাগে না, সেটা শূন্য পথ। আমরা এরোপ্লেনের মত শূন্য পথে চলিতেছি এবং মামা সার্চ্চ লাইটের মত মাঝে মাঝে আমাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন—ভয় হয় কবে গুলি ছুঁড়িবেন, আর আমরা মাটিতে পড়িয়া যাইব।

কানু, তাহার উত্তর লেখে, কোনো ভয় নাই। আমারও মামা ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে যত মামাই থাক, তাহারা সার বাঁধিয়া দাঁড়াই-

লেও উঠন্ত ভাগিনেয় বংশকে রোধ করিতে পারিবেন না। সুতরাং আমি তোমাকে অভয় দিতেছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, এ বড় অন্যায় কথা।

আমি বলিলাম, দোহাই আপনার, শেষ পর্য্যন্ত শুনুন।

কানু-রাণুর মিলন হয় নিভৃতে—প্রতিদিন তাহারা প্রতিজ্ঞা করে; কানু বলে, রাণু, আমি তোমার। রাণু বলে, প্রাণের কানু, আমি তোমার। মামা দূর হইতে বলেন, কথা শুনি কার?

আরো এক বৎসর পরে।

কোন এক জেলার কি এক গ্রামের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত ভক্তরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাণুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে, শোনা যায় সে সুখেই আছে।

সম্পাদক মহাশয় চটিয়া বলিলেন, ভক্তরামের সঙ্গে রাণুর বিবাহ দিবার তোমার কি অধিকার আছে?

আমার কোনো অধিকার নাই।

দিলে কেন?

আমি দেই নাই, কেননা ওটা আমার ব্যবসা নহে।

তবে কে দিয়াছে?

ঘটকের সাহায্যে উহার মামা দিয়াছেন। ইতিমধ্যে রাণুর পিতার মৃত্যু হইয়াছে, মামাই উহার একমাত্র অভিভাবক। মাতার আপত্তি টিকে নাই।

কানুর অপরাধ ছিল কি?

রাণু কুলিনের মেয়ে, কানু ভঙ্গজের সন্তান, মামার স্বভাবের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়ের মুখে কে যেন কালী ঢালিয়া দিল। আমি বুদ্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে টাকা দুইটি তাঁহার সামনে বাহির করিলাম।

সম্পাদক মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—অচল।

আমি ফস করিয়া টেবিলের উপর দুইটি টাকা বাজাইয়া বলিলাম, আসিবার পূর্ব্বেও তিনবার বাজাইয়া দেখিয়াছি।

সম্পাদক মহাশয় কপালের চারিটি ভাঁজের উপরে আরও তিনটি বৃদ্ধি করিয়া বলিলেন, টাকা নয়, গল্প।

আমি বলিলাম, গল্প অচল? তাহা হইলে আমি চলিলাম।

ডিটেকটিব ব্রজবিলাস

বিখ্যাত ডিটেকটিব ব্রজবিলাস সরকারকেও আজ মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হইতেছে।

তিন দিন হইল তিনি কেসটি পাইয়াছেন, কিন্তু এই তিন দিনে নানারূপ কার্য্য-কারণ সংযোগ-বিয়োগ করিয়াও ব্যাপারটির কোনো সূত্রই ধরিতে পারিতেছেন না। তিন দিনে তিনি যে অমানুষিক মস্তিষ্কচালনা করিয়াছেন তাহাতে সাধারণ খুন বা জুয়াচুরি অন্তত তিনটি আস্কারা হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য ব্রজ-বিলাস একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না।

ব্রজবিলাসের ঘরে (পোষাক-ঘরে) ছদ্মবেশ ধারণ করিবার নানারূপ সরঞ্জাম ঝুলিতেছে। তিনি উহারই সাহায্যে ঘটনাসূত্র অনুসরণ

করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু চলিলে কি হয়, কোনোরূপেই সূত্রের দীর্ঘ-বিস্তার পাওয়া যায় না, কিছু দূর গিয়াই খেই হারাইয়া যায়। ব্রজবিলাস এরূপ দীর্ঘসূত্র-ঘটনা পছন্দ করেন না।

ব্রজবিলাস তিন দিনে প্রায় পঁচিশ রকম ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন। বাহিরে যাইবার জন্য নহে, ঘরে বসিয়া চিন্তা করিবার জন্য। তিনি যখন কোনো গোলমালে পড়েন, তখন তিনি কখনো নেপালী, কখনো পাঞ্জাবী, কখনো চীনাম্যান, কখনো সাহেব সাজিয়া আয়নার সম্মুখে বসিয়া চিন্তা করেন। ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতায় অনেক সময় চিন্তাধারার রূপ বদলাইয়া যায়, বিভিন্ন বর্ণের সূত্র আবিষ্কার হয়, ইহাতে রহস্যভেদ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসে। অকৃত্রিম ব্রজবিলাস যখন কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন তিনি চীনাম্যানে রূপান্তরিত হইয়া চিন্তা করিতে থাকেন; চীনাম্যানে রহস্যভেদ না হইলে ইউরোপীয় পোষাক পরিয়া ইউরোপীয় প্রথায় চিন্তা করিতে থাকেন, একটা না একটা লাগিয়া যায়।

কিন্তু আজ ব্রজবিলাস হার মানিয়াছেন। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবীর স্বামী আজ ত্রিশ বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বাহির করিতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা—সঙ্গে নানারূপ পুরস্কার। ত্রিশ বৎসরের সূত্র ধরিয়া পিছু হটিতে হইবে—বাঙলাদেশের ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের সঙ্গে ঘটনা মিলাইতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন, দামোদরের বন্যা, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ, নন-কো-অপারেশন আন্দোলন, সিভিল ডিজোবিডিয়েন্স, ভূমিকম্প প্রভৃতি গুরুতর ঘটনাসমূহ গত ত্রিশ বৎসরের ধারাবাহিকতা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে; রহস্য ঘোরতর জটিল।

মাতঙ্গিনী আজ ত্রিশ বৎসর স্বামী-হারা এবং আঠার বৎসর

বিধবা। স্বামী হারাইবার পর বারো বৎসর পর্য্যন্ত সে মৎস্যাহার করিয়াছে—তাহার পর হইতেই বৈধব্য সুরু। তাহার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ। কিন্তু মাতঙ্গিনী অনুমান করে, তাহার স্বামী মরে নাই। সে সতীসাধ্বী, এই ত্রিশ বৎসর সে অন্য কাহারো কথা চিন্তা করে নাই, একমাত্র স্বামী ছাড়া আর কাহারো স্মৃতি সে পূজা করে নাই। তাহার স্বামীর চেহারা তাহার মনে নাই, কিন্তু কল্পনায় একটি চেহারা সে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল—যেমন করিয়া লোকে ঈশ্বরের আকৃতি প্রস্তুত করে।

পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহ-ব্যাপারে কি একটা গোলমালে তাহার শ্বশুর তাহার সাত বৎসরের স্বামীকে লইয়া চলিয়া যান, বধূর সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ রাখেন নাই। সেই পরিত্যক্তা পাঁচ বৎসরের মাতঙ্গিনী আজ পঁয়ত্রিশ, সে বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাহার পিতৃকুলে আর কেহই জীবিত নাই। গত বৎসর তাহার একমাত্র স্নেহাবলম্বন ভাইটি মারা যাইবার পর হইতে সে অহরহ স্বামীর প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিতেছে।

ডিটেকটিব ব্রজবিলাস এই স্বামী-তল্লাসের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আরো একটি ঘটনা ব্রজবিলাসের দায়িত্ববোধ প্রখর করিয়া তুলিয়াছে ;—মাতঙ্গিনীর স্বামীর নামও ব্রজবিলাস সরকার। ত্রিশ বৎসর নিরুদ্দেশ! খুনী নয়, জালিয়াত নয়, চোর নয়, ডাকাত নয়, কেবল নিরুদ্দেশ! অপরাধীর অনুসন্ধান করা সহজ, কিন্তু শুধুই নিরুদ্দিষ্ট একটি লোককে বাহির করা অত্যন্ত কঠিন। কোন স্থান হইতে ইহার আরম্ভ, কোন পথে ইহার যাত্রা, কোথায় ইহার পরিণতি ?—কে জানে !

কিন্তু কার্য্যোদ্ধার করিতেই হইবে। মাতঙ্গিনীর স্বামীর নাম ব্রজবিলাস সরকার! একটা মধুর যোগাযোগ! বিশাল সম্পত্তির

অধিকারিণী মাতঙ্গিনী, তাহার স্বামীর নামও ব্রজবিলাস! মনে করিতে হৃদয়ে একটা শিহরণ জাগিয়া ওঠে। কিন্তু ডিটেকটিবের কর্ত্তব্য কঠোর, তাহার মধ্যে শিহরণের স্থান নাই। ব্রজবিলাস কল্পনা-বিলাসে মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে পারেন না।

ব্রজবিলাস তাঁহার অনুচর নরহরিকে ডাকিলেন। নরহরি পাশের ঘরে বসিয়া ডায়েরি লিখিতেছিল, ডাক শুনিয়া ডিটেকটিবের ঘরে প্রবেশ করিল।

আদেশ করুন।

লেখ।

নরহরি নোটবুক খুলিয়া লিখিতে লাগিল,—আপনার এলাকায় সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সের যত ব্রজবিলাস সরকার আছে তাহাদের জীবন-ইতিহাস সংগ্রহ করুন। ইহার মধ্যে যদি কোনো স্ত্রী-পরিত্যাগকারী ব্রজবিলাস থাকে, টেলিগ্রাম করুন।

লিখেছি।

টাইপ কর। দুশো কপি দুশো অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের কাছে কালই পাঠাও—আর্জেণ্ট।

নরহরি চলিয়া গেল।

যথাসময়ে দুইশত চিঠি দুইশত অনুসন্ধানকেন্দ্রে প্রেরিত হইল। ব্রজবিলাস চেয়ারে বসিয়া পুনরায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। আরো সাত দিন চলিয়া গেল। দুইশত প্রাইভেট ডিটেকটিব প্রায় চারিশত ব্রজবিলাস সরকারের সন্ধান দিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাদের অধিকাংশই বিবাহিত এবং তাহারা সকলেই সপরিবার ঘর-সংসার করিতেছে। বাদবাকী সকলেই অল্পবয়স্ক, কাহারো বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তবু তাহারা এই চারিশত ব্রজবিলাসের মধ্যে অন্তত দুইশতের

উপর কড়া নজর রাখিল, সন্দেহের কারণ দেখা দিলেই যথাযোগ্য লোককে হস্তগত করিবে।

ব্রজবিলাস হতাশ হইতে হইতেও হতাশ হইলেন না। সকল রকম নিরাশার মধ্যেও তিনি সর্ব্বদা আশার আলো দেখিতে পান, কিছুই তাঁহাকে দমাইতে পারে না।

ব্রজবিলাস ঠিক করিলেন, একাই তদন্ত করিতে হইবে। তিনি মাতঙ্গিনীর নিকট হইতে যে তথ্যটুকু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

অতঃপর তিনি তাহার স্বামীর বাড়ি যেখানে ছিল সেখানে গেলেন। মাতঙ্গিনীর ক্ষীণ স্মৃতিতে শোনা-কথা যেটুকু মনে পড়ে, তাহাতে তাহার স্বামীর বাড়ি ছিল হাতীবাগান। ব্রজবিলাস হাতীবাগানের যাবতীয় প্রাচীন লোককে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, কোন এক সরকার-পরিবার ঠিক ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, একশত নম্বরের বাড়িতে থাকিয়া ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন।

ব্রজবিলাস লাফাইয়া উঠিলেন। ইহার চেয়ে বেশি আর কিছু তিনি আশা করেন না, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট—এমন কি যথেষ্টের চেয়েও বেশি। ত্রিশ বৎসর—সরকার পরিবার—ছেলের বিবাহ, সমস্ত মিলিয়া গিয়াছে। বুদ্ধি! বুদ্ধি! নিছক বুদ্ধি! মাতঙ্গিনী দেবীর দশ হাজার টাকা ব্রজবিলাসের প্রায় হাতের মুঠায় আসিয়া পড়িল। ত্রিশ বৎসর—সরকার-পরিবার—ছেলের বিবাহ! ব্রজবিলাসের ডিটেকটিব-জন্ম সার্থক।

ব্রজবিলাস হাতীবাগানের একশত নম্বর বাড়িকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার গবেষণা আরম্ভ করিলেন। প্রায় তিন মাস প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া অতি নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। গ্রে ষ্ট্রীটে, এই

তিন মাসে দুইটি লোক খুন হইল, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তিনটি লোক গাড়ি-চাপা পড়িল। ব্রজবিলাস স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পিছনে লোক লাগিয়াছে। ডিটেকটিবের প্রাণ লইতে আসিয়া হত্যাকারী ভুল লোককে খুন করিয়াছে, এবং ভুল লোককে গাড়ি-চাপা দিয়াছে। ভুল ত তাহারা করিবেই! ব্রজবিলাস কি আর স্বাভাবিক চেহারা লইয়া বাহিরে কাজ করেন?

ব্রজবিলাস তিন মাস অক্লান্ত অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, সেই সরকার-পরিবার প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল সে-বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কোথায় উঠিয়া গিয়াছে—তাহাও ব্রজবিলাস সংগ্রহ করিলেন।

সরকার-পরিবার ত্রিশ বৎসর হইল মৌলালিতে উঠিয়া গিয়াছে। এইবার মৌলালিতে অনুসন্ধানের পালা। প্রতিভার কাছে ত্রিশ বৎসরের বাধা বাধাই নয়। বাড়ি আবিষ্কার হইল; বাড়িটি দেখিবামাত্র তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সফলতা লাভ হইবার বহু পূর্ব্বেই মনে তাহার আভাস জাগিয়া ওঠে। চোখ নাচিতে থাকে, মাথার উপর অকারণ টিকটিকি লাফাইয়া পড়ে, থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে একটা আনন্দ-শিহরণ খেলিয়া যায়।

মৌলালির ত্রিশ নম্বরের বাড়ি দেখিয়াই ব্রজবিলাস বুঝিলেন, তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। মনে হইল গত জন্মে, এমনকি, জন্ম-জন্ম ধরিয়া তিনি এই বাড়িতেই বাস করিয়াছেন। পূর্ব্ব-জন্মের একটি ক্ষীণ স্মৃতি দূরাগত ধ্বনির মত তাঁহার মর্ম্মে বাজিতে লাগিল। মন বলিয়া উঠিল, পাইয়াছি, পাইয়াছি।

তাঁহার দুইশত ইনফর্মার যে দুইশত ব্রজবিলাস সরকারের উপর নজর রাখিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি পুনরায় দুইশত পত্রদ্বারা তাঁহার

সফলতার কথা জানাইয়া দিলেন। দুইশত ব্রজবিলাস সরকার আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল। ব্রজবিলাসের মন বলিল, পৃথিবীতে যত ব্রজবিলাস আছে, সকলেরই শুভদিন আসিয়াছে।

ব্রজবিলাস মাতঙ্গিনী দেবীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, কথা দিচ্ছি, স্বামী ফিরে পাবেন; সফলতা অনতিদূরে। বাড়ির সন্ধান পেয়েছি—আর দু'তিনটে ধাপ পার হলেই স্বামী আপনার হাতের মধ্যে।

ত্রিশ নম্বর বাড়ির গবেষণায় প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু ছয় মাস অন্তে ব্রজবিলাস আবিষ্কার করিলেন প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ত্রিশ নম্বর বাড়িতে এক সরকার-পরিবার বাস করিত; তাহারা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পটলডাঙ্গার চল্লিশ নম্বর বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে।

ব্রজবিলাস ইহা শুনিয়া মৌলালির পথের উপর বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন। নরহরি তাঁহার মাথায় খবরের কাগজ দিয়া হাওয়া করিতে করিতে ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি করা যায়?

ব্রজবিলাস পকেট হইতে চারিটা পয়সা তাহার হাতে দিয়া, তাহার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—একটা ডাব আন।

ডাবের জল খাইয়া ব্রজবিলাস একটু শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাড়ি গিয়া শুইয়া পড়িলেন। এইবার, বোধহয় এই প্রথম, ব্রজবিলাস সত্যই হতাশ হইলেন। এত পরিশ্রমের এই পরিণাম! শেষে চল্লিশ নম্বর বাড়ি! এ বাড়ি যে তাঁহারই পৈতৃক বাড়ি—এবং এই বাড়িতেই যে তিনি জ্ঞান হওয়া অবধি বাস করিতেছেন!

হঠাৎ তাঁহার স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেও এইরূপ হইয়াছে। অবসাদ আসিলেই তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী মনোরমার কথা মনে পড়িয়া যায়। মনোরমা তিন বৎসর হইল মারা গিয়াছেন,

কিন্তু আজ তাঁহার বাঁচিয়া থাকা উচিত ছিল। ব্রজবিলাসের ব্যর্থতার বোঝা যে একমাত্র তিনিই ঘাড় হইতে নামাইয়া লইতে পারিতেন।

ব্রজবিলাসের সমস্ত ভুল হইয়া গেল। নদীর সমস্ত স্রোত একটা মরুভূমিতে আসিয়া শেষ হইল! ভীষণ মরুভূমি—একটি মরীচিকাও নাই যাহা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্যও সান্ত্বনা পাওয়া যাইতে পারে। ভুল হইয়া গেল, তিনি ডিটেকটিব; ভুল হইয়া গেল, তিনি মাতঙ্গিনীর স্বামী খুঁজিয়া দিবেন; ভুল হইয়া গেল, তিনি এতদুপলক্ষে একহাজার টাকা পূর্ব্বেই মারিয়াছেন। তিনি স্ত্রীর জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু একি বিদ্যুৎ? না না, বিদ্যুৎ নহে। একটি নূতন আইডীয়া তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে ঝলকিয়া উঠিল। ব্রজবিলাস কান্না শেষ করিতে পারিলেন না; অৰ্দ্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই উঠিয়া পড়িলেন। এই চল্লিশ নম্বর বাড়ি হইতেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইবে।

ব্রজবিলাস নরহরিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, নরহরি আসিলে তাহাকে চারিটি আদেশ দিলেন—

১। তিন নম্বর ঘর খুলে দাও।

২। এক বাক্স বর্ম্মাচুরুট টেবিলে রাখ।

৩। শাদা কাগজের বড় খাতা ও একটি পেন্সিল রাখ।

৪। বরফ জল রাখ।

নরহরি চকিতে আদেশ পালন করিল। তিন নম্বর ঘর তাঁহার তপস্যার ঘর; এই ঘরে ইতিপূর্ব্বে তিনটি খুন আস্কারা হইয়াছে—ঘরটি একাগ্র চিন্তার পক্ষে উৎকৃষ্ট। আজ আর ছদ্মবেশ নয়, আজ তিনি সাদাসিধা ব্রজবিলাস।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চিন্তা চলিল।

সকালে উঠিয়া ব্রজবিলাস বাড়ির সমস্ত দেওয়ালগুলি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পরীক্ষা করিলেন। সমস্ত দরজা জানালার মাপ লইলেন। পুরাতন সিন্ধুক বাক্স প্রভৃতি খুলিলেন। কোথায়ও কি কোনো চিহ্ন নাই? এক-একবার ক্ষোভে তাঁহার মন অস্থির হইয়া ওঠে; সেই মুহূর্ত্তে মাতঙ্গিনী দেবীর স্বামীকে তাঁহার স্বর্গীয়া স্ত্রীর ভ্রাতা বলিয়া কটূক্তি করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু শব্দগুলি গলা পর্য্যন্ত আসে, উচ্চারণ হয় না। না, না, এখনি মাথা খারাপ করিবার সময় আসে নাই, এখনি কটূক্তি করিবার সময় আসে নাই। করিতে হয়, পরে করা যাইবে।—শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ব্রজবিলাস কোনো সিদ্ধান্তই করেন না।

ব্রজবিলাস পুবাতন কাগজ-পত্র ঘাঁটিতে লাগিলেন; আহারনিদ্রা ভুলিয়া তিনি আর একবার কর্ত্তব্যে ডুবিয়া গেলেন। হাতে তিন-চারিটি গুরুতর 'কেস্' ছিল, তাহা ভুলিয়া মাতঙ্গিনীর স্বামী খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই ভাবে অনুসন্ধান করেন; মনে পড়িল কারনার্ভন এই ভাবেই টুটেনখামনের সমাধি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছিলেন; এবং ইহা ছাড়া আরো অনেক বিষয় মনে পড়িল, অধীর হইলে চলিবে কেন?

ব্রজবিলাস হঠাৎ কতকগুলি মূল্যবান কাগজপত্র আবিষ্কার করিলেন, বহু পুরাতন চিঠি। ব্রজবিলাস আবার লাফাইয়া উঠিলেন। মন বলিল,—পাইয়াছি, পাইয়াছি।

চিঠিগুলি একে একে পড়িলেন, পড়িতে পড়িতে অন্ধকার আকাশ চিরিয়া পুনরায় বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল। ব্রজবিলাস আরো একবার লাফাইলেন। না—আর কোনো ভুল নাই—চল্লিশ নম্বর বাড়ি হইতেই নির্ঘাত তাহার সন্ধান মিলিল। ধন্য ব্রজবিলাস, ধন্য ব্রজবিলাসের প্রতিভা।

ব্রজবিলাস তীরের ন্যায় নিজেকে পথে নিক্ষেপ করিলেন। ট্যাক্সি নহে—যেন উল্কা ছুটিয়া চলিয়াছে। ব্রজবিলাস হাঁপাইতে হাঁপাইতে মাতঙ্গিনী দেবীর বাড়িতে গিয়া হঠাৎ তাঁহাকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, পেয়েছি দেবী, এই নাও তোমার ব্রজবিলাসকে।

মাতঙ্গিনী দেবী সোরগোল করিবার উপক্রম করিতেই ব্রজবিলাস তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আমিই তোমার স্বামী! ছেলেবেলায় আমাদের বিয়ে হয়েছিল, তারপর তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে' আমার বাবা তোমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ রাখেননি। এই দেখ প্রমাণ—বলিয়া ব্রজবিলাস পুরাতন চিঠিগুলি একে একে তাহার সামনে খুলিয়া ধরিলেন। মাতঙ্গিনী স্তম্ভিত—একবার মনে হইয়াছিল, সব প্রতারণা—কিন্তু ব্রজবিলাস তাহাকে এত জোরে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে সন্দেহ করিবার আর অবকাশ ছিল না।

কিন্তু তবুও মাতঙ্গিনী মূঢ়ের মত কাঁদিয়া উঠিল, এবং ডিটেকটিবকে দিবার জন্য যে বাকী নয় হাজার টাকা তাহার হাতে ছিল, সন্দেহ দূর হইবামাত্র সে তাহা কাঁদিতে কাঁদিতেই আঁচলে বাঁধিতে লাগিল।

অকস্মাৎ

কুলির সঙ্গে একটি পয়সা লইয়া খিটিমিটি বাধাতে ট্রেনের ভিতর হইতে একটি শীর্ণ-স্বাস্থ্য ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "মশাই, সামান্য কারণে গোলমাল না ক'রে পয়সাটা ফেলে দিন।" আমি কেবল আইন দেখাইয়া এবং জেদ করিয়াই অতিরিক্ত পয়সা দিতেছিলাম না; এখন দিলাম, যেন ঐ ভদ্রলোকের জন্যই দিতে হইল। কুলি বিদায় হইলে ভদ্রলোক বলিলেন, "সামান্য কারণে কি কাণ্ডটাই না হ'তে পারে সে বিষয়ে একটা গল্প শুনুন।" আমি বলিলাম, "গাড়িটা ছাড়ুক, ধীরে-সুস্থে শোনা যাবে।" ভদ্রলোক স্মিতহাস্যে কহিলেন, "বেশ।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল—গল্পও আরম্ভ হইল। ভদ্রলোক একটি সিগারেট ধরাইয়া এবং একটি সিগারেট আমাকে দিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আমাদের জীবনে যা কিছু অসঙ্গতি তার মূলে রয়েছে বোঝবার ভুল। এরই ফলে রামচন্দ্র সীতাকে হারিয়েছিলেন এবং সেদিন আমাদের পাড়ার রামচরণ মুদি ঠিক এই কারণেই একটি খদ্দেরকে হারিয়েছে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র অথবা রামচরণ মুদিকে নিয়ে কথা নয়, আমার কথা হচ্ছে আমাকে নিয়ে। আমি সেদিন বড় যন্ত্রণা পেয়েছি। কিন্তু সেটা বলবার পূর্ব্বে কিছু কথা আছে। আপনি জানেন, বিবাহ ব্যাপারে পূর্ব্বরাগ ঘটে থাকলেও অনেক পুরুষ ব'লে থাকেন, 'ওঃ কি ভুলই করেছি।' এদের কথাটা কিছু বোঝা যায়, কিন্তু যাদের বিয়ে অভিভাবকে ঠিক ক'রে দেন তারা যখন বলে, 'ভুল করেছি,'—তখন

সে কথাটা ভাল বোঝা যায় না, কেননা এক্ষেত্রে তাদের ভুল করবার কিংবা না করবার স্বাধীনতা কই ?

"ব্যাপারটা খুলেই বলি। কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে স্বাস্থ্যটা খারাপ হ'য়ে যায়, ডাক্তার বলেন, 'প্রাতর্ভ্রমণ কর'। তাঁরই উপদেশ মত কিছুদিন বাস্-এ উঠে শ্যামবাজার-ভবানীপুর করলাম। কলকাতার পথে বাস্-এ উঠতে আমি দেহে মনে সঙ্কুচিত হই। মনে-মনে হই বাস্-চালকের পথের আইন ভঙ্গ করায় ; এবং দেহে হই ভিড়ে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোথাও পৌছুতে হ'লে অনির্দ্দিষ্ট-গামী বাস্-এ না ওঠাই ভাল। আমার কিন্তু বাস্-এ বেড়ানোটা ঠিক এই কারণেই সার্থক হয়েছিল। পথে দেরী হ'ত এবং সে জন্যে তার খোলা-ছাদে বেশিক্ষণ থাকবার সুযোগ পেতাম।

"আমি পা না চালিয়ে প্রাতর্ভ্রমণের যে উপায় বের করেছি তাতে আমার এক হৃত-স্বাস্থ্য বন্ধু আমার উপর ভারি খুশী হ'য়ে উঠলেন, তিনি বললেন, মাস-পয়লা একখানা টিকিট কিনে আমার পন্থা অনুসরণ করবেন।

"আমি কিন্তু দিন-দশেক বাস্-এ ঘুরে আজ হাওয়া বদল করতে যাচ্ছি গিরিডি। যে যাই বলুক মশাই, কলকাতা থেকে স্বাস্থ্য লাভ হয় না।

"কিন্তু সে কথা থাক। সে দিন বিডন ষ্ট্রীটের মোড় থেকে একটি মহিলা এবং তাঁর সঙ্গে একটি পুরুষ একত্র বাস্-এ উঠলেন। ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন বাঙালী আরোহী তাঁদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, কারণ বাস্-এ আর জায়গা ছিল না। ওঁরা খালি সীট দুটো অধিকার ক'রে পাশাপাশি বসলেন। পুরুষটির বয়স ত্রিশ হবে, মহিলাটির হবে কুড়ি বাইশ। তাঁরা যে স্বামী-স্ত্রী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না।

কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে বড় অপ্রীতিকর হ'য়ে উঠল। মহিলাটির আকৃতিতে এমন একটা উজ্জ্বল দীপ্তি ছিল যাতে তাঁর দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারিনি। কিন্তু তাঁর স্বামী! যেমন কুৎসিত, তেমনি ইতর ব'লে মনে হ'ল। ময়লা জামা, রুগ্ন চেহারা, ঠোঁটের চারিদিক তাম্বুলরাগরঞ্জিত। এর উপর আবার বিড়ি ধরিয়েছে। মনে হ'ল এ মানুষের ভুল নয়, বিধাতার ভুল। পৃথিবীতে কেন এই অসঙ্গতি! একটা বানর মুক্তামালা গলায় প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কি বোঝে মুক্তা আর কাঁচে কতখানি তফাৎ?

"এই মহিলাটি কি সমাজের এই অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন নয়? পিতা কিংবা অন্য কোনো পরমাত্মীয় কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে যে-কোনো একটা হতভাগাকে ধ'রে এই রত্নটিকে গছিয়ে দিয়েছে। যার হাতে পড়েছে সে যে কতখানি অনুপযুক্ত তা তার চেহারাতেই প্রমাণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভদ্রলোক একটু থামিলেন। আমি চুপ করিয়াই রহিলাম। ভদ্রলোক আর একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"হায়রে সমাজ! তুমি কেবল গোত্র এবং কোষ্ঠী মিলিয়ে বেড়াচ্ছ, এদিকে মানুষের প্রকৃতিটাকে দিয়েছ বাদ! এই বর্ব্বরতা আর কত দিন চলবে! কিন্তু সে যাই হোক, যাকে চোখের সামনে দেখছি সে আত্মবলি দিয়েছে সামাজিক ব্যবস্থার কাছে না দারিদ্র্যের কাছে?

"আমার মনে নানারকম চিন্তা আসতে লাগল। একবার মনে হ'ল হয়ত আমারি ভুল—ওরা বেশ সুখেই আছে, হয়ত ঐ মেয়েটি ওকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। কিন্তু তাই বা কেন হয়? আর যদি হয়ই তা হ'লে আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন? মনকে বোঝালাম, কিন্তু মাথাব্যথা কমলো না। রুচি-বিকার অনেক

দেখেছি, বইতেও পড়েছি, কিন্তু এ রকম অসম্ভব রুচি-বিকার আমার কল্পনাব বাইরে ছিল। যে দিন ওদের বিয়ে হ'ল সেদিন শুভ-দৃষ্টির সময় নববধূ যদি চোখ চেয়ে স্বামীকে দেখে থাকে তা হ'লে সেদিন ও যা আঘাত পেয়েছে, তার তুলনা কই? তারপর মনে একটা বিবমিষার ভাব নিয়ে ও এই পশুকে দিনের পর দিন সহ্য ক'রে গেছে। এই বর্ব্বর স্বামী যেদিন প্রেমে গদগদ হ'য়ে ওর কানের কাছে ভালবাসার কথা শুনিয়েছে, সেদিন ও কি বাণবিদ্ধা হরিণীর মত বেদনায় ছটফট করেনি? তারপর ধীরে ধীরে তিলে তিলে এই পিশাচটাকে ও নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। ওর যে একটা সহজ আনন্দ এবং স্ত্রী-সুলভ চপলতা ছিল, তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ওকে নিজের সঙ্গে কি সংগ্রামটাই না করতে হয়েছে। এইখানেই মেয়েদের বিশেষত্ব। মশাই, আর একটু ধৈর্য্য ধরে ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। আমার মনের অবস্থাটা ঠিক মত না বলতে পারলে এ কাহিনীর কোন মূল্য নেই।"

আমি বলিলাম, "আপনি একটানা ব'লে যান—থামবেন না।"

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন,—

"মেয়েদের বিশেষত্বের কথা বলছিলাম। কিন্তু এ বিশেষত্ব সেকেলে হ'য়ে পড়েছে। যারা আজীবন শুনে এসেছে 'পতি পরম গুরু', যারা এর বেশি আর চিন্তা করতে জানে না, এ বিশেষত্ব তাদের। কিন্তু এটা আর থাকছে না। কাঙালীচরণকে দেখেছি। সে তার বৌকে যখন-তখন ধরে মারত, বৌটি সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় চীৎকার করতে করতে পথে বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু এটা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। পরক্ষণেই পিঠের ব্যথা ভুলে স্বামীকে সেবা করবার জন্যে তার কি ঐকান্তিক আগ্রহই না দেখা যেত।

"এই কাঙালীচরণের সংসারে তার স্ত্রী ছাড়া একটিমাত্র ছাগল ছিল। দৌরাত্ম্যে দুজনেই ছিল প্রায় সমধর্ম্মী। বৌটি স্বামী এবং ছাগল এ দুজনকেই যা যত্ন করত, কোন দেবতাও তাঁর ভক্তের কাছ থেকে এর বেশি পান কিনা সন্দেহ।

"মশাই, এই যে অত্যাচার সহ্য ক'রেও স্বামীকে সেবা করা এর একটা সৌন্দর্য্য আছেই, কিন্তু আমি দুপাতা ইংরেজি পড়ে সেটা আর দেখতে পাই না। আমার মাথায় এখন স্বাতন্ত্র্যবাদ ঢুকেছে—আমি মনে করি, অত্যাচারিত মেয়েদের তরফ থেকে সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

"আগে মনে হ'ত স্ত্রীজাতির উপর সমাজের অত্যাচার—এটা অত্যন্ত বাজে কথা। বাইরে থেকে বিদেশীরা মনে করে বটে, কিন্তু ঘরের সীমানার মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রী অত্যন্ত স্বাধীন—এমনকি পুরুষ যে পরিমাণে রাজা, ওরা সেই পরিমাণে রাণী।

"কিন্তু ব্যাপারটাকে সেভাবে আর দেখতে পারছি না। আচ্ছা এ সব কথা এখন যাক। বাস্-এর মধ্যে আমার মনের অবস্থা কি হ'ল, আপনি বুঝতে পারছেন। যে স্বামী কথায় অথবা কাজে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে সেটা কোন-না-কোন দিন শুধরে যেতে পারে, কোন এক সময় স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার থেমে যেতে পারে, কিন্তু যে স্বামী নিজের বর্ব্বর চেহারা এবং তার চেয়ে বেশি বর্ব্বর ব্যবহার দ্বারা লক্ষ্মী স্ত্রীকে শাস্তি দিতে থাকে, তার কি কখনো পরিবর্ত্তন হয়? মানুষের পক্ষে দেবতা হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু পশু কি ক'রে দেবতা হয়?

"কথা শুনে বুঝতে পারছেন, আমি একটু ভাবপ্রবণ, কাজেই সামনের সেই দম্পতীকে দেখে আমার মাথা ঘুরে উঠল। ওরা প্রকৃত সুখে আছে কি দুঃখে আছে সেটা আমার জানবার উপায় ছিল না,

কিন্তু আমার মনে হ'ল সামাজিক অন্যায়ের এরা যেন একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সামাজিক দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ ক'রে আমার শুধু মাথা ঘোরা নয়, রক্ত গরম হ'য়ে উঠল। আমি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী, আমার পক্ষে সে একটা কি প্রাণান্তকর ব্যাপার বলুন দেখি!

"মনকে শান্ত করবার জন্যে এদের এই মিলনের মূল কথাটা বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। কোন্ পুরুষ কোন্ মেয়েকে পছন্দ করবে এর একটা নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না। বইয়ে পড়েছি অনেক স্ত্রী অত্যাচারী স্বামীকে পছন্দ করে, আবার অনেকে করে না। কিন্তু এসব ভেবেও কোন সান্ত্বনা মিলল না। ভাবলাম যদি শরীর ভাল হয়, তা হ'লে সমাজের এই অন্যায় ব্যবস্থা দূর করবার কাজে লাগব।"

ভদ্রলোক এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিলেন, এবং একটা সিগারেট ধরাইয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। আমি একটু অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারপর?"

উত্তর পাইলাম, "তারপর? আগে বলেছি মনের অবস্থাটা ঠিকমত না বলতে পারলে এই গল্পের কোন মূল্য নেই। এখন বলছি মনের অবস্থাটাই এর গল্প। সেটা আপনি শুনেছেন, কাজেই এখন বলতে বাধা নেই যে, আমি যখন সমাজের কথা ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছি, তখন দেখি সেই কদাকার বর্ব্বর লোকটি এস্প্ল্যানেডের মোড়ে নেমে গেল, মেয়েটি যেমন বসে ছিল তেমনই বসে রইল। স্পষ্টই বোঝা গেল, এরা স্বামী স্ত্রী মোটেই নয়। দুজন পরস্পর সম্পূর্ণ অপরিচিত, একসঙ্গে বাস্-এ উঠেছে এবং জায়গা খালি পেয়ে একসঙ্গে বসেছে মাত্র। মশাই, অকস্মাৎ এত গভীর দুঃখ এবং দুরন্ত উত্তেজনা এত সহজে জীবনে আর কখনো দূর হয় নি।"

অজয়ের ভুল

রাম এবং শ্যাম ভুল করে। হরি, যদু এবং মধু ভুল করে—কিন্তু অজয় সেন!—ছি ছি সেও ভুল করিল!

সে যে বি-এস-সি পাস। পদার্থ-বিজ্ঞানে সে অনার্স পাইয়াছে, কিন্তু তাহার সামান্য একটা ভুলে সমস্ত দেশের বুকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

বিশেষ কিছুই না, সে যে মেসে থাকে তাহার পাশের বাড়িতে একটি মেয়েকে সে কয়েক দিন হইল দেখিয়াছে, এবং শুধু দেখা নয়, তাহার নাম পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছে।

অজয় নিজের মেসে মরালিষ্ট নামে যুগপৎ খ্যাত এবং উপহসিত। তাহার ঘরের দরজার উপরে একবার কে একখানা কাগজে মরালিষ্ট কথাটির সমাস-সঙ্গত রূপটি লিখিয়া আঁটিয়া দিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল, মরা লিস্টে যে স্থান পাইয়াছে সে মরালিষ্ট।—অর্থাৎ যাহার প্রাণ নাই, যে শুষ্ক, নীরস, জড়।

অজয় সেন থিয়েটার দেখে না, কিন্তু সিনেমা দেখে। তার মতে নর্ত্তকীর রক্ত-মাংসের রূপ মহা অপবিত্র, কিন্তু চিত্র-রূপে সে দর্শনযোগ্য।

কাজেই অজয় যে দিন হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে পাশের বাড়ির সামনের জানালায় তাকাইলে যখন-তখন চোখে পড়ে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের মেয়েকে, সেই দিন হইতে তাহার দক্ষিণ দিকের জানালা বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু ইহাতে মনটা যে পরিমাণে ঠাণ্ডা হইল, দেহটা হাওয়ার অভাবে সেই পরিমাণে ঘামিতে লাগিল। এমন হইল যে ঘরে টেকাই দায়। অজয় ইচ্ছা করিলে অন্য ঘরে যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা সে গেল না। তাহার মনে হইল অন্য ছেলে আসিয়া ঐ জানালা খুলিবে, এবং মেয়েটির দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবে, মেয়েটি বিরক্ত হইয়া জানালা বন্ধ করিবে,—কিন্তু যা গরম পড়িয়াছে সে পুরুষ হইয়া সহ্য করিতে পারিতেছে না, মেয়েটি ত মেয়ে মাত্র। অজয় আর চিন্তা করিতে পারিল না, হঠাৎ আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, এ ঘর কিছুতে ছাড়া হইবে না।

অজয়ের বিশেষ ভয় ছিল ললিত মিত্তিরের দলকে। ললিতের বুদ্ধির চেয়ে গোঁয়ার্ত্তুমির প্রাবল্য ছিল বেশি। সে অজয়কে ভাল ছেলে বলিয়া শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু তাহার সাধুতাকে বিদ্রূপ করিত। সে ভাল সেতার বাজাইতে পারিত বলিয়া তাহার কয়েকটি অনুচর ছিল—তাহারা প্রায় সর্ব্বদা ললিতের সঙ্গে থাকিত।

বাল্যকাল হইতেই ললিতের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাব অনুমান করিয়া কে তাহার নাম দিয়াছিল—হোঁৎকা-হোঁদল।

ললিত অজযের সহপাঠী, কিন্তু অজয় বি-এস-সি পাস করিয়া এম-এস-সি পড়িতেছে—ললিত বি-এস-সি ক্লাসেই রহিয়া গিয়াছে। উহারা এক মেসেই থাকে।

অজয় এই হোঁৎকা-হোঁদলকে স্মরণ করিয়া সে ঘর ছাড়িতে পারিল না—অথচ গরম অসহ্য হইয়া উঠিল। অগত্যা জানালা খুলিতেই হইল, কিন্তু জানালা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটি বন্ধ করিতে হইল।

কিন্তু এরূপ অবস্থায় চোখকে শাসনে রাখাই দায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজয়ের দৃষ্টি একবার সামনের জানালার দিকে চকিতে ছুটিয়া গিয়া

ফিরিয়া আসিল। কোনো জিনিসের দ্রুত ছাপ গ্রহণ করিবার পক্ষে চোখের ক্ষমতা অসীম। মাত্র এক সেকেণ্ডের দৃষ্টিপাতে অজয়ের মনের মধ্যে যে ছবিটির ছাপ পড়িল তাহাতে চওড়া-লাল-চেক-পাড়-শাড়ী পরিহিতা পাঠ-নিরতা একটি বালিকা মূর্ত্তিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

কট্‌কটে ব্যাং যেমন লম্বা জিভ বাহির করিয়া দূরের খাদ্যবস্তু চকিতে মুখের মধ্যে টানিয়া লয়, অজয়ের দৃষ্টি তেমনি করিয়া বালিকার মূর্ত্তিটিকে নিজের মনের মধ্যে টানিয়া আনিল।

অজয় দেখিল ছবিটি বড় পবিত্র। সহসা তাহার মনে হইল, দেখিবার অধিকার তাহার আছে। সে পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্স, তাহার এই নবাবিষ্কৃত অধিকারটি প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত ফিজিক্স-শাস্ত্রকে আহ্বান করিল। আলো-ও-বিদ্যুৎ-বিভাগ হইতে আলো আসিয়া বলিল, হে অজয়, তুমি যে দেখ ইহার অর্থ কি?

অজয় কহিল, সে কথা বিস্তারিত লিখিয়া ত একবার পাস করিয়াছি, আবার বলিতে হইবে?

আলো প্রখর ভাবে উত্তর দিল, হাঁ।

অজয় বলিতে লাগিল, প্রত্যেক বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলো চোখের ডায়াফ্রামযুক্ত লেন্সের ভিতর দিয়া গিয়া রেটিনার উপর এক বিন্দুতে মিলিত হয়। লেন্সটি এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে ঐ আলো সমান্তরালভাবে আসিলেও লেন্স ভেদ করিয়া যাইবার সময় চারিদিক হইতেই তাহাদের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সূক্ষ্ম বিন্দুতে গিয়া ফোকাস্ হয়, এই ফোকাস্ রেটিনা স্পর্শ করিবামাত্র সেখান হইতে স্নায়ু তাহাদের সাড়া বহন করিয়া লইয়া গিয়া মগজের বিশেষ অংশের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়, এবং তখনি বুঝিতে পারি সম্মুখে কোনো বস্তু রহিয়াছে। এই বুঝিতে পারার নাম দেখা।

আলো কহিল, চমৎকার।

অজয় বলিতে লাগিল, আমরা যাহাকে মনে করি দেখিতেছি, তাহাকে দেখি না; তাহা হইতে প্রতিফলিত আলোর স্পর্শটি মাত্র অনুভব করি, এবং ভুল করিয়া মনে করি, তাহাকেই দেখিতেছি।

আলো খুশী হইয়া বলিল, কি বোঝা গেল?

অজয় বলিল, বুঝিলাম, আমার দেখার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কেন-না দেখা দ্বারা আমরা কোন বস্তুকে অপবিত্র করিতে পারি না।

অজয়ের মন হইতে গুরুতর বোঝা নামিয়া গেল। সে এক দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল। আর তাহার মনে কোনো সঙ্কোচ নাই।

অজয় ভাবিতে লাগিল, তাহার দেখা কি নির্ব্বিকার, কি বৈজ্ঞানিক, অন্য লোকের দেখা হইতে তাহা কত তফাৎ।

সে একটি বেলা ঐ জানালার দিকে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটি কতবার ঘরে আসিল, চলিয়া গেল, একখানা বই খুলিয়া খানিকটা পড়িল, খাতায় খানিকটা কি লিখিল—সমস্তই অজয় দেখিল। দেখিতে দেখিতে প্রচুর সুখে মগ্ন হইয়া গিয়াছে, এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল। অজয় তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দরজাটি খুলিয়াই দেখে হ্যাৎকা-হোঁদলের দল বাহিরে দাঁড়াইয়া।

অজয় হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া মনে করিল, হায়, এই সময় যদি অদৃশ্য হওয়া যাইত, তাহা হইলে ইহাদের হাত হইতে সম্ভবত বাঁচা যাইত। কিন্তু মনে করিলেই আর অদৃশ্য হওয়া যায় না, কাজেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া অজয় শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

ললিত জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

অজয় গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, পিন্-হোল-এক্সপেরিমেণ্ট।

ললিত বলিল, দক্ষিণ দিকে কেন ?

অজয় চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তবু যতদূর সম্ভব গম্ভীর ভাবেই বলিল, পিন্-হোল-এক্সপেরিমেণ্ট।

হোঁৎকা-হোঁদলের দল চুপ করিল।

পিন্-হোল-পরীক্ষা ক্রমশ নিয়মিত ভাবে চলিতে লাগিল। উহারা মনে করিল কোন গবেষণা চলিতেছে।

৯ নম্বর ঘরটি অজয়কে নেশার মত পাইয়া বসিল। ক্রমে দেখা গেল ঘরের চেহারা ফিরিয়া যাইতেছে।—ঘরে নূতন নূতন ছবি টাঙানো হইয়াছে—প্রতিদিন টাটকা ফুল আসিয়া ফুলদানিতে আশ্রয় পাইতেছে।

হোঁৎকা-হোঁদলের দল আবার হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপাব কি ?

অজয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, পিন্-হোল-এক্সপেরিমেণ্ট।

উহারা রহস্য ভেদ করিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে আঁচ করিল, অজয় ফিজিক্স ছাড়িয়া বটানি ধরিয়াছে, এবং জগদীশ বসু হইবার চেষ্টায় আছে।

আলো যখন শব্দে রূপান্তরিত হয় সিনেমার ছবি তখন কথা বলে, কিন্তু অজয়ের বেলায় তাহার দৃষ্টি-বিজ্ঞানের সমস্ত আলো নীরবতায় রূপান্তরিত হইল। অজয় সেন কথা কহা কমাইয়া ফেলিল। তাহার প্রতিবেশিনীর প্রতিকৃতির প্রতিফলিত আলো বিদ্যুতে রূপান্তরিত হইয়া তাহার শিরা-উপশিরায় খেলা করিতে লাগিল।

কিন্তু কেবল দেখিয়া দেখিয়া ত বাঁচা যায় না। অজয় একদা সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল সে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। কেননা প্রতিবেশিনীই তাহাকে সমস্ত দিয়াছে—তাহার প্রাণে আনন্দ দিয়াছে,

চোখে তৃপ্তি দিয়াছে—অথচ সে এমনি হতভাগ্য যে তাহার কিছুই প্রতিদান দিতে পারে নাই। প্রতিদান না দিক, কিন্তু কৃতজ্ঞতাটুকুও ত দেওয়া যায়!

অজয় চিঠি লিখিবার কাগজ বাহির করিয়া অপরিচিতার নামে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল। সে বাড়ির আট বৎসরের এক ছেলের নিকট হইতে কৌশল করিয়া অজয় বহুপূর্ব্বেই মেয়েটির নাম জানিয়া লইয়াছিল কারণ এইটুকু না করিলে সে পাগল হইয়া যাইত।

অজয় লিখিল, হে অপরিচিতা, তোমাকে দেখিয়া দেখিয়া আমাব চোখের তৃপ্তি নাই। কিন্তু এই কথাটি হঠাৎ পড়িয়া তোমার কি মনে হইতে পারে তাহা আমি আগেই অনুমান করিয়া বলিতেছি যে তুমি ভুল বুঝিও না। তোমাকে আমার এই জানালা দিয়া দিনের পর দিন দেখিয়া যাইতেছি, কিন্তু তোমাকে যদি বুঝাইয়া দিতে পারি দেখার থিওরিটি কি, তাহা হইলে বুঝিবে আমার পক্ষে কোনো রকম ধৃষ্টতা করাই সম্ভব নহে। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছি। তুমি যে লাল রঙের, নীল রঙের, সবুজ রঙের শাড়ী পর সে কি প্রকৃতই লাল, নীল অথবা সবুজ? প্রকৃতই কি, তাহা কেহ জানে না। উহা হইতে ইথার তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া আমার চোখে ঐরূপ রঙের বোধ জন্মাইয়াছে। তোমার গতিভঙ্গিমা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু গতির প্রকৃতি কি? উহা কি অনেকগুলি স্থিতির পাশাপাশি সন্নিবেশ নহে? তাহা না হইলে সিনেমায় ছবি ওঠে কেমন করিয়া?—যাহাই হউক, তোমার মূর্ত্তি আমাকে যে আনন্দ দিয়াছে তাহারই বিনিময়ে তোমাকে কিছু আনন্দ দিতে চাই। শুধু আনন্দ দিব না—উহার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা দিব। আমি এমনি চিঠি রোজ লিখিব। ইতি—

চিঠি লিখিয়া অজয়ের বড় সুখবোধ হইল, এবং নিজ হাতে চিঠিখানা খামে পুরিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিল।

চিঠি ডাকে দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অজয় একটা মোহের মধ্যে ডুবিয়া ছিল, কিন্তু চিঠি ছাড়িবামাত্র মোহ কাটিয়া গেল, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার এ কি মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল! ঐ চিঠি যদি অন্যের হাতে পড়ে, যদি সে বৈজ্ঞানিক-লেখার অর্থ না বুঝিতে পারে অথবা যদি বুঝিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার জবাব দেয়, তাহা হইলে তাহার যে সর্ব্বনাশ হইবে। সে চট করিয়া ভবিষ্যতের একখানা ছবি মনে মনে আঁকিয়া লইয়া তাহার দিকে চাহিল—দেখিল সমস্তই অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। পুরাতন গানের একটি কলি তাহার মনে আসিল,—সে জন ফেরে না আর, যে গেছে চলে। অজয় বুঝিল চিঠি আর ফিরিবে না। সে চিন্তা-মূঢ় হইয়া চিঠির বাক্স ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় ললিতের দল সেই পথে দেখা দিল। ললিত হঠাৎ অজয়ের ঘাড়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

অজয় ভীষণ ভাবে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তদ্দণ্ডেই আত্মস্থ হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, ল' অব গ্র্যাভিটেশান।

হোঁৎকা-হোঁদলের দল সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

অজয়ের মাথা ঘুরিতেছে, পা আর চলে না। তাহার ভয়ানক ইচ্ছা হইতে লাগিল ললিতকে ডাকিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া বলে, ভাই, আমাকে রক্ষা কর—কিন্তু ডাকিতে গিয়া গলার স্বর বাহির হইল না। অজয় মাটিতে বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এলোমেলো চিন্তার পর সহসা একটা প্ল্যান তাহার মাথায়

আসিল। আর্কিমিডিসের মত আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া অজয় ঘরের দিকে ছুটিল।

এক ঘণ্টা পরে সে অঞ্চলে বিষম হৈ চৈ—ডাকবাক্সের ভিতরে কে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে, সমস্ত চিঠি পুড়িয়া গেল।

এই সংবাদ কাগজে বাহির হইবামাত্র সাত দিনের মধ্যে সংবাদ পাওয়া গেল—ভারতবর্ষের সমস্ত শহরের ডাকবাক্সে আগুন জ্বলিতেছে। অজয় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে—সে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে সে সরকারকে জব্দ করিবার জন্য এ কাজ করে নাই। কিন্তু দুষ্ট লোকে বুঝিল এ তাহাদেরই দলের কাহারো কাজ, এবং ইহা ডাকবাক্স পুড়াইবার একটা ইঙ্গিত। সুতরাং তাহাদিগকে দমন করা এখন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে—দিনের পর দিন চিঠির বাক্স পুড়িতেছে।

তিনি

তিনি আসিতেছেন। একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। শহরের লোকের তিন দিন রাত্রে ঘুম নাই, দিনে ভাল করিয়া খাওয়া হয় না—কাজে মন বসে না। ১১ই ভাদ্র তিনি আসিবেন, আজ ১০ই, শহরময় শিশু যুবক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, সকলেরই ভয়—তিনি আসিলে পাছে তাঁহার যত্নের ত্রুটি হয়। হাওড়া ষ্টেশনে বেলা ১০॥টায় যে গাড়ি আসিবে সেই গাড়িতে তাঁহার আসিবার কথা। গাড়ি হইতে তিনি নামিবামাত্র তাঁহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করা হইবে ইহা লইয়া আজ পনেরো দিন ধরিয়া তর্কবিতর্কের আর শেষ নাই। কেহ বলিতেছে ফুলের মালা গলায় পরাইয়া আটশত বালিকা অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাহিবে, কেহ বলিতেছে তিনি ট্রেন হইতে নামিবামাত্র একশত একটি কামান আওয়াজ করিতে হইবে। আর একদল তর্ক তুলিয়াছে, কামান কোথায় পাওয়া যাইবে, ওরকম অসম্ভব কথা আমরা শুনিব না, আমরা একশতটি জয়ঢাক বাজাইতে চাই। এ তর্কের শেষ না হওয়াতে স্থির হইল, সকলের কথাই রাখিতে হইবে, ফুলের মালাও গলায় উঠিবে, কামানও ছাড়িতে হইবে, জয়ঢাকও বাজিবে। আবার কথা উঠিল, কামান কোথায় পাওয়া যাইবে। কামানের দল হইতে একজন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, যেখান হইতে হউক কামান যোগাড় করিতেই হইবে, না হইলে মান থাকিবে না।

জয়ঢাকের পক্ষ হইতে একজন বলিল, আমরা উহা লইয়া মাথা

ঘামাইতে পারিব না, আমাদের কাজ আমরা করিয়া যাইব। কামান জোটে ভাল, না জোটে জয়ঢাক বাজিবে। মালার দলের একজন বলিল, আমাদেরও সেই কথা, কামান যদি না পাওয়া যায় মালা গলায় উঠিবেই।

কামানপক্ষীয় ইহা শুনিয়া বলিল, আমরা সে ভার লইতেছি, আমাদের কামানের আওয়াজ লইয়া তোমাদের মাথা ব্যথার কারণ দেখি না। উত্তর এবং দক্ষিণ শহরের লোকদের মধ্যে তর্ক চলিল এবং সহজেই দুই দলের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল। ঠিক হইল উত্তর এবং দক্ষিণ শহরের সকলেই অভ্যর্থনা সমিতিতে যোগ দিতে পারিবে। উত্তর শহর ফুল এবং জয়ঢাক—দক্ষিণ শহর হার্মনিয়ম এবং গান করিবার জন্য সাড়ে তিনশত বালিকা যোগাড় করিবে। ইহা ছাড়া তিনি উত্তরেও যাইতে পারিবেন না, দক্ষিণেও যাইতে পারিবেন না, উত্তর দক্ষিণের মাঝামাঝি হ্যারিসন রোডের ধর্ম্মশালায় উঠিবেন। আরো কথা হইল, ষ্টেশন হইতে ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে কার্পেট বিছাইয়া দিতে হইবে এবং দক্ষিণ শহরের পীড়াপীড়িতে ঠিক হইল সমস্ত পথ গ্যাস এবং বিদ্যুৎ দ্বারা আলোকিত করিতে হইবে, দিনের বেলা বলিয়া খাতির করা চলিবে না।

আলোচনা চলিতেছে ইতিমধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, আসল কথাটাই চাপা পড়িয়াছে—তাঁহাকে আনা হইবে কিসে? ষ্টেশন হইতে কি ট্যাক্সিতে আসিবেন? এই কথা শুনিবামাত্র সভার মধ্যে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই এক কথা—তাই ত, তিনি আসিবেন কিসে? অনেক গবেষণা হইল, অনেক তর্ক হইল—পাঁচ মিনিট পরামর্শ করিয়া দক্ষিণ শহরের প্রতিনিধিরা ঠিক করিয়া ফেলিল তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া আনিতে হইবে, কারণ এত বড় মহৎ

লোককে পশু কিংবা হাওয়া গাড়ি বহন করিবে ইহা কিছুতেই হইতে পারে না।

আজ ১১ই ভাদ্র। শহরের উত্তেজনা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে—রাজপথে কাতারে কাতারে লোক জড়ো হইয়াছে। ভাদ্র মাসের আকাশ—পালা করিয়া বৃষ্টি এবং রৌদ্র জনতার শিরে বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু কাহারো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আজ কলিকাতার পক্ষে এক স্মরণীয় দিন। সকলেরই মনে বিস্ময় এবং উল্লাস জাগিয়া উঠিয়াছে। পকেট-কাটাগণ এই সুযোগে নির্ব্বিবাদে দুই হাতে লোকের পকেট কাটিয়া বেড়াইতেছে। গাড়ি ঘোড়া ট্রাম বাস্ সব বন্ধ—ভিড়ের ভিতরে কাহারো চলিবার উপায় নাই। আজ ১০॥টায় তিনি আসিবেন—হাওড়া ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য—গঙ্গার পুল ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। শত শত লোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। একশতটি জয়ঢাক আসিবার কথা ছিল, কিন্তু কলিকাতার সমস্ত জয়ঢাকওয়ালা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। আজ দক্ষিণ শহরের জয় জয়কার। এক সঙ্গে চারিজন লোকের ঘাড়ে উঠিয়া তিনি ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিবেন। কিন্তু ষ্টেশন হইতে ধর্ম্মশালা কতটুক পথ? দক্ষিণ শহরের লোকের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? সমস্ত শহরের লোক তাহাকে একটু দেখিবার জন্য আজ পনেরো দিন হইতে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে, দর্শন-পিপাসায় তাহাদের কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, তাহারা কি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না? তাহাদের পিপাসা কি মিটিবে না? ইহা কখনো সম্ভব নহে। তিনি ষ্টেশন হইতে আসিয়া হ্যারিসন রোড—চিৎপুর রোডের সঙ্গম স্থলের নিকটে

যে ধর্ম্মশালা আছে সেখানে উঠিবেন বটে, কিন্তু সোজা পথে তিনি আসিবেন না।

তিনি ষ্টেশন হইতে প্রথম ষ্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়া আলিপুর খিদিরপুর হইয়া কালিঘাট যাইবেন। সেখান হইতে টালিগঞ্জ হইয়া বালিগঞ্জে আসিবেন, তার পর সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় রসারোড চৌরঙ্গী ধর্ম্মতলা হইয়া শিয়ালদহে আসিবেন। সেখান হইতে হ্যারিসন রোড দিয়া কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, সেখান হইতে পুনরায় ফিরিয়া সমস্ত বৌবাজার ষ্ট্রীট প্রদক্ষিণ করিবেন। তারপর সেখান হইতে ছাতাওয়ালা গলির ভিতর হাম্সং চাং নামক একজন চীনাম্যানের সঙ্গে দেখা করিয়া ক্যানিং ষ্ট্রীট হইয়া চিৎপুরের পথে বাগবাজার যাইবেন। বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে সার্কুলার রোডে পড়িয়া বরাবর শিয়ালদহে আসিবেন এবং আবার হ্যারিসন রোড দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে এবং সেখান হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া শ্যামবাজারে আসিবেন। তারপর শ্যামবাজার হইতে বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়া পুনরায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া গ্রে ষ্ট্রীটে পড়িবেন। সেখান হইতে চিৎপুর রোডে আসিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ একবার বীডন ষ্ট্রীটটা ঘুরিয়া আসিবেন। বীডন ষ্ট্রীট দেখা শেষ হইলেই চিৎপুর দিয়া সোজা ধর্ম্মশালায় গিয়া উঠিবেন। সমস্ত ব্যাপারটা শেষ করিতে তিন দিন লাগিবে এবং এই তিন দিনে তিনি ক্রমান্বয়ে তিনশত লোকের ঘাড়ে উঠিবেন। এবং তিনশত লোকেও যদি অকুলান হয় তাহা হইলে আরো তিনশত অতিরিক্ত লোক তাঁহাকে বহন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। গত রাত্রি হইতে এই ছয় শত লোক ঘাড়ে ক্রমাগত নানারূপ তেল মালিশ করিয়া আসিতেছে।

হাওড়া ষ্টেশন। বেলা ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। সকাল হইতে যতগুলি গাড়ি ষ্টেশনে আসিয়াছে তাহার যাত্রীগণ কেহই প্রবল ভিড় ঠেলিয়া ষ্টেশনের বাহিরে যাইতে পারে নাই—প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেহ মনে করিতেছে ভালই হইল, তাঁহাকে দেখিবার এমন শস্তা এবং সহজ সুযোগ ত আর মিলিত না। আবার কেহ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুখ চোখ বিকৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—গাল পাড়িয়া যে একটু মনের জ্বালা মিটাইবে সে উপায়ও নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলেই প্রহার খাইতে হইবে,—রকম-সকম দেখিয়া এটা তাহারা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল।

ঐ যে গাড়ি দেখা যায়—এঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিতেছে। লক্ষ লোকের হর্ষ-ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। ঠেলাঠেলি এবং উত্তেজনায় কত লোক চাপা পড়িয়া জখম হইল, কত লোক মরিয়া গেল তাহা দেখিবার সময় কাহারো ছিল না।

গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। ভলাণ্টিয়ারগণ অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে তাঁহার কামরার দরজা খুলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি কি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে, পতিতকে উদ্ধার করিতে সত্যই আসিলেন? আর কোনো সন্দেহ নাই, তিনি সত্যই আসিয়াছেন। ঐ যে দেখা যাইতেছে। ঐ যে তিনি,—মাথায় জটা, মুখে দাড়ি, হাতে চুরুট, পরনে বাঘছালের হাফ্‌প্যাণ্ট, পায়ে বুট জুতা। ঐ যে তাঁহার হাত ব্যাগ নামিল—উপরে লেখা রহিয়াছে "Glass with Care." গায়ে কিছুই নাই, দাড়ি কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে—উহাই সমস্ত বক্ষঃস্থল ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মুখচোখের রং ঘোর লাল—দেখিবামাত্র মনে একই সঙ্গে ভয় এবং ভক্তি সঞ্চার হয়। কি উন্নত শির, কি বলিষ্ঠ দেহ-গঠন আর কি জ্যোতির্ম্ময় চাহনি!

তিনি নামিবামাত্র তাঁহার পায়ের ধূলা লইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ভিড়ের চাপে কেহই নীচু হইয়া পা ছুঁইতে পারিতেছে না। অথচ পায়ের ধূলা না লইতে পারিলে এত পরিশ্রম, এত আড়ম্বর সব বৃথা হয়। ধূলা লইতেই হইবে। একজন বলিষ্ঠ এবং জোয়ান ভক্ত উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণপণ শক্তিতে পাশের লোকগুলিকে ঠেলিয়া দিয়া হঠাৎ তাঁহার পা ধরিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। একটি লোকের সাষ্টাঙ্গ প্রণামের দরুন যে জায়গাটা ফাঁকা হইল সেইখানে আরো একজন হঠাৎ তাঁহার আর এক পা ধরিয়া শুইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া কাছে যত লোক ছিল সকলেই একে একে সটান শুইয়া পড়িল। পাশে ত আর জায়গা ছিল না। কাজেই পরে যাহারা পায়ের ধূলা লইবার জন্য আসিল তাহারা সকলেই পর পর পিঠের উপর শুইতে লাগিল। তাঁহার পা আর স্পর্শ কবা যায় না—কিন্তু ভক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠে তখন কোনো দিকেই খেয়াল থাকে না। যাহারা তখনো দাঁড়াইয়াছিল তাহারা মনে করিল শোয়া লোকগুলিই প্রকৃত ভক্তি দেখাইতেছে—আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না।

ইহা মনে হইতেই তাহাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি এবং প্রেরণা জাগিয়া উঠিল। তখন একযোগে হৈ হৈ করিতে করিতে সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। লোকের মনে তখন আগুন জ্বলিতেছে, তাহাদের আবেগ থামায় কাহার সাধ্য? তিন মিনিটের মধ্যে সেখানে শোয়া-লোকের একটা পাহাড় রচিত হইল। সে দৃশ্য কি অপরূপ! ঝুড়ির মধ্যে ইলিশ মাছকে যেমন চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সাজাইয়া রাখা হয়, ইহারাও অনেকটা সেই ধরণে তাঁহাকে ঘিরিয়া হাওড়া প্ল্যাটফর্মে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিল। তিনি মাঝখানে দাঁড়াইয়া—কিন্তু শায়িত মানুষের গাদা ভেদ করিয়া কাহার দৃষ্টি তাঁহার

কাছে পৌঁছিবে ? যাহারা স্তূপের উপর উঠিতে পাবিল না তাহারা অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। স্তূপের উপর শুইয়া পড়িতে তাহাদেব যে ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে। ইচ্ছা পূরা মাত্রায়ই ছিল, শুধু উপায় ছিল না। হাওড়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মেব উপরে যে টিনের চাউনি আছে স্তূপের উচ্চতা প্রায় তত দূবই পৌঁছিয়াছে—মাঝখানে সামান্য কয়েক ফুট ফাঁকা আছে বটে কিন্তু টিন রৌদ্র-তাপে এত গরম হইয়া উঠিয়াছে যে সেখানে কাহারো থাকা অসম্ভব। উপরের লোকগুলিরই যদি এই অবস্থা তাহা হইলে সকলের নীচের স্তরের লোকগুলি এত লোকের চাপে বাঁচিয়া আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কিন্তু ইহার পবেই যে ঘটনাটি ঘটিল তাহাতেই সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গিয়াছে।

পায়ের ধূলাপ্রার্থী শোয়া-লোকগুলির এইরূপ স্বার্থপর ব্যবহারে বাহিরের লোকগুলি অত্যন্ত চটিয়া গিয়া স্তূপ ভাঙিয়া দিবার জন্য জোর পরামর্শ করিতে লাগিল। একজন সরস-চরিত্রের লোক বলিল, আমি সব গণ্ডগোল মিটাইয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া সে স্তূপের নীচের লোকগুলিব পায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কাহারো পা একটু নড়িল না। ইহাতে সে মর্ম্মাহত হইয়া চিমটি কাটিতে লাগিল, কিন্তু কোনো সাড়া নাই। লোকটি অবাক হইয়া পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একজনের পায়ের নীচে একটা জলন্ত কাঠি ধরিল—তথাপি কোনো সাড়া মিলিল না। সকলে বুঝিতে পারিল উহাবা আর বাঁচিয়া নাই। তখন বিবেচনাশূন্য হইয়া উহারা স্তূপের উপরকার লোকগুলির পা ধরিয়া টানিয়া নামাইতে লাগিল। লোকগুলি “ধূলা পাই নাই” “ধূলা পাই নাই” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নীচে পড়িতে লাগিল। তিন-চারিশত লোককে

যখন হিড় হিড় করিয়া টানিয়া সরাইয়া দেওয়া হইল তখন দেখা গেল তিনি স্থির দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিয়া আছেন। মনে হইল যেন ষ্টেশনের ঘড়ি দেখিতেছেন! তাঁহাকে দেখিতে পাইবামাত্র আবার আনন্দকোলাহল, আবার জয়ধ্বনির ফোয়ারা ছুটিল। কতগুলি লোক চীৎকার করিয়া বলিল, ঐ দেখ ঐ দেখ তিনি পোষাক বদলাইয়া ফেলিয়াছেন—পরনে সে বাঘছালের হাফ্‌প্যাণ্ট নাই, পায়ের বুটজুতা কোথায় গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সিল্কের পাঞ্জাবি, গেরুয়া রঙের ধুতি এবং পেটেণ্ট লেদারের সেলিম জুতা পরিয়াছেন। কেবল মাথার জটাগুলি ঠিক রহিয়াছে। একজন আন্দাজ করিল ভক্তেরা পায়ের ধূলা পাইবার জন্য টানাটানি করিয়া পায়ের জুতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে এবং পা মনে করিয়া বাঘছালের হাফ্‌প্যাণ্ট ধরিয়া টানাটানি করাতে সেটাও আর রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার স্যুট্‌কেস্ পাশেই ছিল, স্তূপের নীচের লোকগুলি মরিয়া যাইবার পর যখন তাহাদের মুষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল তখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছেন।

আজ ১৫ই ভাদ্র। ১১ই তারিখ হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়াছেন। যে ছয় শত লোক ঘাড়ে তেল মালিশ করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া ধন্য হইতে চাহিয়াছিল তাহাদের সকলেই একে একে তাঁহাকে বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে উত্তর শহরের দুই শত এবং দক্ষিণ শহরের চারি শত লোক মিলিয়া ছয় শত বাহক পূরা হইয়াছিল। এদিক দিয়াও দক্ষিণ শহরই জয়লাভ করিয়াছে।

কিন্তু আজ ১৫ই ভাদ্র। আজ বিরাট সভা। তিনি আজ সভায় উপস্থিত থাকিবেন, আসিলে তাঁহার জন্যই এই সভা আহ্বান করা

হইয়াছে। কলিকাতা এবং মফঃস্বল মিলিয়া যাহাতে দশ লক্ষ লোক তাহাকে দেখিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গড়ের মাঠে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

বিকাল চারিটার সময় তিনি সভায় উপস্থিত হইবেন, কিন্তু সকাল হইতেই কাতারে কাতারে ময়দানের দিকে লোক চলিতেছে। সমগ্র বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত এরূপ দৃশ্য কেহ দেখে নাই। সকলে বলাবলি করিতেছে, মোহনবাগান-ডারহাম খেলাতেও এরূপ ভিড় কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। খেলা ত খেলা মাত্র, উহার বেশি কিছু নহে—কিন্তু যাহা সকল খেলার উপরে—যাহার উপরে লোকের বিপুল ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে—যাঁহাকে দেখিলে কতখানি পুণ্য লাভ হইবে কেহ তাহা কল্পনা করিতে পারে না—তাহার সঙ্গে খেলার তুলনা?

তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মনুমেণ্ট হইতে বিদ্যুতের পাখা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি আসনে বসিয়া হাওয়া খাইতেছেন। আজ তাঁহার চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত। শুনা যাইতেছে ছাতাওয়ালা গলিতে ঢুকিয়া হাস্থং চাং-এর সঙ্গে দেখা করিবার পর হইতে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় বিস্ফারিত আঁখি অর্দ্ধেক বুজিয়া গিয়াছে।

সভাপতি দাঁড়াইয়া মাইক্রোফোনের কাছে মুখ দিয়া কথা আরম্ভ করিলেন। বেতার যন্ত্রে যাহাতে তাঁহার বক্তৃতা এবং সভার যাবতীয় আলোচনা সমস্ত বাঙালী শুনিতে পারে এই বিবেচনা করিয়াই সভাস্থলে মাইক্রোফোন স্থাপন করা হইয়াছে। বিরাট সভার প্রত্যেকেই যাহাতে বক্তৃতাদি নিখুঁৎ ভাবে শুনিতে পারে তাহার জন্য অনেকগুলি লাউড স্পীকার বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলকথা কোনো দিকেই কোনো ত্রুটি দেখা যাইতেছে না, কেননা আজ রামা-শ্যামা-যদু-মধু নহে, আজ সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন তিনি।

সভাপতি বলিতে লাগিলেন—

আজ যাঁহার জন্য এই সভা, তিনি কে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া রস-ভঙ্গ করিবেন না। আমি নিজেও জানি না তিনি কে। তিনি চিরকাল আছেন, এবং চিরকাল থাকিবেন, মাঝখানে আমরা সাধারণ লোকেরা নদীর স্রোতের মত বহিয়া যাইব—পিছনে কোনো চিহ্ন রাখিয়া যাইব না। অতএব তিনি "কে" এই অনাবশ্যক প্রশ্নটি তুলিবার কোনো দরকার নাই। তাঁহার নিকট হইতে যতটা পারি গ্রহণ করি—ইহাই আমাদের এখনকার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। গ্রহণ করিব এইটিই বড় কথা—কি গ্রহণ করিব, কেন গ্রহণ করিব, এই সব যুক্তিহীন প্রশ্ন আজ চাপা পড়ুক।

আপনারা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, তিনি ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের দিকে মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিতেছেন,—ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি আজ কেবল ফুটবলের পরিণতি সম্বন্ধেই যাহা কিছু বলিবেন। হয়ত তিনি বলিবেন, বৃহৎ জিনিস মাত্রেই গোলাকার হইয়া থাকে। আকাশের সূর্য্য চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র সমস্তই গোলাকার—এবং ফুটবলও গোলাকার। ইহাতে কি বুঝা যায়? কি বুঝা যায় তাহা অবশ্য আপনারাও জানেন না, আমিও জানি না—জানিলে এই সভার কোনো প্রয়োজনই হইত না। আমরা কিছু জানি না বলিয়াই তিনি আসিয়াছেন, আমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই তিনি দেখা দিয়াছেন, অথবা এরূপও হইতে পারে তিনি সম্পূর্ণ অন্য কিছু ব্যক্ত করিবেন। কিন্তু আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন এ সমস্তই আমার অনুমান মাত্র, কারণ চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারার বিদ্যা আমি কখনো শিখি নাই। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সভাপতি বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চটাপট্ হাততালি পড়িতে লাগিল।

হাততালির পালা শেষ হইলে দক্ষিণ শহরের দলপতি উঠিয়া বলিলেন, এইমাত্র সভাপতি মহাশয় যাহা অনুমান করিলেন তাহার সহিত আমার অনুমানের ঘোর অনৈক্য আছে। আমি শীঘ্রই আপনাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছি।

এই কথা বলিয়া দক্ষিণ শহরের দলপতি তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখচোখ অতি নিপুণ ভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই জনের মুখের দূরত্ব রহিল মাত্র পাঁচ ইঞ্চি। ইহাতে নিকটস্থ ভদ্রলোকেরা বিপদ আশঙ্কা করিয়া খুব ভয়ে ভয়ে সে দিকে তাকাইয়া রহিল। দক্ষিণ শহরের দলপতি যদি তাঁহাকে এই ভাবে অকারণ অপমান করেন তাহা হইলে তাঁহাকে তাহারা মারিয়া ফেলিতেও ইতস্তত করিবে না—কয়েকজন ব্যায়াম সমিতির সভ্য এইরূপ পরামর্শ করিলে লাগিল।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ ভয়ঙ্কর কিছু করিবার দরকার হইল না, কারণ দলপতি চট্ করিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, তিনি কি বলিবেন আমি তাহা যথার্থ অনুমান করিয়াছি। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা যাহা বলিয়াছেন তাহা মূল বিষয়ের চর্ম্মও ভেদ করে নাই—কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, আপনারা লক্ষ্য করিবেন—তাহা চর্ম্ম ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। বন্ধুবর বলিয়াছেন তিনি ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন, অতএব ফুটবল সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন। ইহার চেয়ে অন্তঃসারশূন্য কথা আর হইতে পারে না। তাকাইয়া থাকাই যদি দেখা হইত তাহা হইলে ত আমরা সকলেই দেখি। আমরা সকলেই ত তাহা হইলে দার্শনিক! কিন্তু ইহা অত্যন্ত সহজেই বুঝা যাইবে যে আমরা দার্শনিক নহি। তাহা যদি হইতাম তাহা হইলে আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? আমরা দার্শনিক নহি ইহা

যখন একপ্রকার স্থির হইয়া গেল,—তখন কোন্ কথাটিকে আর রোধ করা যায় না? কোন্ কথাটি একেবারে শরৎ কালের আকাশের মত অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিল? সে কথাটি কি এখনো আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? তিনি যে একজন ঘোরতর দার্শনিক ছাড়া আর কিছু নহেন এ কথা কি এখনো আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না? দেখুন, এখনো আপনারা আমার কথা চুপচাপ মানিয়া যান—তাহা না হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। আমার সামান্য কথাতেই যাহা প্রমাণ হইল তাহার জন্য অন্য প্রমাণ উপস্থিত করা আমি নীচতা এবং অতি জঘন্য স্বার্থপরতা বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু তথাপি আপনাদের তুষ্টির জন্য আমি যে-কোনো কাজ করিতে রাজি আছি। অর্থাৎ এই মুহূর্ত্তেই আমি আরো একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। সে দৃষ্টান্ত আমার হাতের কাছেই আছে। তাঁহার কাছে ঐ যে হাত-ব্যাগ রহিয়াছে উহা খুলিলেই আমরা দেখিতে পাইব উহার ভিতরে এই বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত প্ল্যান রহিয়াছে। আমার কথা সত্য হইলে এ ব্যাপারটাও সত্য হইতে বাধ্য। এই দেখুন, আমি এই ব্যাগ খুলিতেছি। এই বলিয়া দক্ষিণ শহরের দলপতি ব্যাগ আনিবার জন্য তাঁহার কাছে গিয়া দেখিতে পাইলেন তিনি ব্যাগ শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। দলপতি ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ব্যাগের দিকে হাত বাড়াইলেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ উহা অন্যদিকে সরাইয়া হাঁটুর নীচে চাপা দিলেন। ব্যাগ সরাইবার সময় তাহার ভিতর হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া আওয়াজ হইল; উপরে লেখা ছিল "Glass with care" সে কথাটা দলপতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন; এখন হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, আমি ত সামান্য মানব।

আপনাদিগকে এখন একটি ভয়ানক কথা বলিব। আমি যাঁহাকে সামান্য দার্শনিক বলিয়া খাড়া করিয়াছি, তিনি সে সব কিছুই নহেন, তিনি দেবতা। তিনি মানবজাতিকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য হাতব্যাগে অমৃত বহন করিয়া আনিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি বক্তৃতা দিবার পর আমাদিগকে অমৃত পান করাইবেন। আপনারা যাঁহারা অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে চান, তাঁহারা দয়া করিয়া বসিয়া থাকুন, সভাভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ উঠিয়া যাইবেন না।

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ প্রায় তিন লক্ষ লোক তাহাদের মতামত জানাইবার জন্য এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তে সভার এক কোণ হইতে একটা ভীষণ কোলাহল আরম্ভ হইল। সহস্র লোকের কণ্ঠস্বর যেন একটি লাইন ধরিয়া ক্রমশঃ সভাপতির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। সকলেই অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দশ মিনিট পর সভাপতি দেখিতে পাইলেন একটা বলিষ্ঠ-দেহ খর্ব্বাকৃতি চীনাম্যান একটা কাপড়ের প্যাকেট লইয়া ভিড় ঠেলিয়া মনুমেণ্টের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। এইবার তিনিও উহাকে দেখিতে পাইলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁহার নিমীলিত চক্ষু সম্পূর্ণ খুলিয়া গেল, তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাতব্যাগটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া তবলা বাজাইবার ভঙ্গিতে ব্যাগ বাজাইতে লাগিলেন। আঙুলের প্রতি আঘাতে ভিতর হইতে ঠুং ঠাং আওয়াজ হইতে লাগিল। যাহারা পূর্ব্বে লক্ষ্য করে নাই তাহারা লক্ষ্য করিল ব্যাগের উপরে লেখা রহিয়াছে "Glass with care"।

চীনাম্যান হন্ হন্ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহার সঙ্গে যে কাপড়ের বাণ্ডিল ছিল তাহার এক দিকে লেখা আছে

হাস্থং চাং। ইহা দেখিয়া সকলেই হাস্থং চাংকে নমস্কার করিল। হাস্থং চাং সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমার সাহায্যে তিনবার তুড়ি দিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ হাস্থং চাং-এর দিকে চাহিয়া অনুরূপ তুড়ির সাহায্যে তাহার উত্তর দিলেন। তাঁহার তুড়ির ইঙ্গিত পাইবামাত্র হাস্থং চাং বাঘের মত চারি পাশের লোকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া এক এক জন করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বাণ্ডিল খুলিয়া ফেলিল। বাণ্ডিলের ভিতর কালো রঙের বারো হাত লম্বা এবং বারো হাত চওড়া একখণ্ড মোটা কাপড় ছিল। সেই কাপড় দিয়া হাস্থং চাং ফস্ করিয়া তাঁহাকে ঢাকিয়া দিল। এবং তড়িৎবেগে সে নিজেও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাহির হইতে কিছুই দেখা যায় না। কেবল দেখা গেল কালো কাপড় মাঝে মাঝে নড়িয়া উঠিতেছে এবং শোনা গেল ভিতরে কাঁচের গেলাসের আওয়াজ হইতেছে। আধ ঘণ্টাকাল বাহিরের লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন আকাশ ঘোর কালো হইয়া উঠিয়াছে। একজন বৃদ্ধ বলিলেন, তিনি জীবনে কখনো এরূপ গুরুতর মেঘ দেখেন নাই। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল। তারপর দশ লক্ষ লোকের ছুটাছুটি এবং চীৎকার; কোথায় রহিলেন তিনি, আর কোথায় রহিল হাস্থং চাং। বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিয়া দলে দলে লোক তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া ঘরে লইয়া যাইবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কোথায় তিনি?—ঐ যে ঐ যে তিনি এবং হাস্থং চাং আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় মরিয়া পড়িয়া আছেন! এবং পাশে পড়িয়া আছে চীনা-মদের তিনটি বোতল, কতকগুলি ঔষধ এবং দুইটি পাইপ।

এ সংবাদ বিদ্যুৎ-বেগে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। চারি লক্ষ

লোক সমস্বরে বলিল হায় হায় হায়। অন্য চারি লক্ষ লোক বলিল—হো হো হো হি হি হি। বাকী দুই লক্ষ লোক নীরবে সভা ত্যাগ করিয়া গেল।

হায় হায়-এর দল প্রচার করিল, তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন—এই হাস্থং চাং বন্ধুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে ভুলাইয়া সমস্ত অমৃত দখল করিতে আসিয়াছিল, সে তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে—এবং অমৃত পান করিতে গিয়া মাত্রাধিক্য বশত নিজেও মরিয়া গিয়াছে।

হোহো হিহির দল প্রচার করিল, ওসব কিছু না। তিনি কিছুদিন হইতে হাস্থং চাং-এর নিকট চণ্ডু খাইতে শিখিয়াছিলেন—আজ চণ্ডু এবং মদ এক সঙ্গে খাইতে গিয়া কোনো অজ্ঞাত কারণে দুই জনেই মারা গিয়াছেন।

হায় হায়-এর দল জিজ্ঞাসা করিল—তিনি কে, এবং হাস্থং চাং কে?

হোহো হিহির দল বলিল, তাঁহার পেটের উপরকার দাগ দেখিয়া বুঝিলাম তিনি কাশীর বিখ্যাত গুণ্ডা আটিয়া সিং। চীনাটাকে চিনি না।

হায় হায়-এর দল বলিল, মিথ্যা কথা, এবং মহামানব সম্বন্ধে এ একটা হীনতম জঘন্য অপবাদ।

অতঃপর হাস্থং চাং হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া হায় হায়-এর দল তাঁহাকে ঘাড়ে করিল, এবং হোহো হিহির দল হাস্থং চাংকে ঘাড়ে করিল। দুই দল এক সঙ্গে শ্মশানে রওনা হইল, এবং দুই দল একসঙ্গে গান ধরিল। প্রথম দল গাহিতে লাগিল, কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব। দ্বিতীয় দল গাহিতে লাগিল, বাগিচায় বুলবুলি তুই—। তৃতীয় দল এসব কিছুই করিল না, তাহারা পরদিন ওয়েলিংটন স্কয়ারে সভা করিয়া স্থির করিল যে আত্মা দেহ-ঘটিত মৃত্যু-অবসানে পর পর সাতটি নভস্তরে বাস করিয়া ভগবানে লীন হয়।

প্ল্যান

নির্ব্বিবাদে মাষ্টারি করিতেছিলাম, কিন্তু ক্রমে উহা অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ছাত্র-জীবনের অন্তহীন উচ্চাশাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহারই কোনো একটা বিকলাঙ্গ খণ্ড গলায় ঝুলাইয়া দিনের পর দিন স্কুলে হাজিরা দেওয়া—ইহার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে ?

প্রাইভেট গাড়ির নম্বর দেখিতে দেখিতে ৩৪ হাজারে পৌঁছিয়াছে, ইলেক্‌ট্রিক কম্পানির বাড়ির মাথায় ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছে, ট্রামগাড়ি প্রতি বৎসর রং বদলাইতে বদলাইতে শাদা হইয়া উঠিল, আমার শুইবার ঘরের মেঝে হইতে পায়ে চলার পথ বেশি পালিশ ঠেকে, তাকাইলে মুখ দেখা যায়। ভোটের মরশুমে শতশত সদস্য-পদপ্রার্থী "হে ওয়ার্ডবাসী তোমার উপকার করিবই" বলিয়া মুঠা মুঠা টাকা পথে পথে ছড়াইল, দেখিয়া দেখিয়া মন খারাপ হইয়া ওঠে। ভাষার অক্ষমতার দরুন নিজেকে কীটস্য কীট পর্য্যন্ত মনে হয়, ভাষায় কুলাইলে কি যে মনে না হইতে পারিত তাহাই ভাবি। এরূপ অবস্থায় চল্লিশ টাকা বাঁধা মাহিনায় তৃপ্ত থাকিতে পারে তাহারাই যাহারা গোয়ালে বসিয়া বাঁধা খোরাক পাইতে পছন্দ করে।

চল্লিশটি টাকার জন্য শালিখা হইতে কালিঘাট যাইতে হয়। পৈতৃক বাড়ি শালিখায়, ছাড়িবার উপায় নাই, অথচ শালিখার চতুঃসীমার মধ্যে একটি চাকরি জুটিল না, কাজেই পথ-খরচ বাদে যে ত্রিশটি টাকা বাঁচে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ দার্শনিক তত্ত্ব—মায়াবাদ হইতে

লেনিনবাদ, ইভলিউশন হইতে রিভলিউশন কত কি আপন আপন খুশী মত মনের মধ্যে নৃত্য করিতে থাকে। আহিরীটোলা-ঘাট পার হইয়া যখন নিমতলা ট্রামে হেয়ার ষ্ট্রীট ডালহৌসি স্কয়ার ভেদ করিয়া চলি, তখন "আমি কে ?"—দর্শনের এই অমীমাংসিত প্রশ্নটি মনের মধ্যে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া জাগিয়া ওঠে।

দর্শন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই—উত্তর দিয়াছে ক্লাইভ ষ্ট্রীট। একবার গিয়া দেখিলেই হয়। পথে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইলেই বুঝিতে পারি, ভোগের অধিকার আমার নাই, আমি সংসারভীরু সন্ন্যাসী। জীবনের সকল প্রকার আনন্দ হইতে আমি চিরবঞ্চিত, ভোগ কাহাকে বলে আমি জানি না; আমি ত্রিশ দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া পনের মাইল যাতায়াত করিয়া মাত্র চল্লিশটি টাকা পাই—যাহা ক্লাইভ ষ্ট্রীট সৌধ-সমূহের সামান্য এক টুকরা পাথরের দামও নয়।

যাহাদের মনের চারিদিকে কঠিন আবরণ পড়িয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। বাহিরের কোনো কিছুই তাহাদের সেই আববণ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারা মহৎ। কিন্তু আমি মহৎ নহি, আমার মনের একটা দিক একেবারে খোলা। ডালহৌসি স্কয়ার ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বজগৎ সেই পথে যাতায়াত করে—আমি বুঝিতে পারি, আমি কে।

অনেক রকম চিন্তা করিলাম। পৈতৃক টাকা কিছু ব্যাঙ্কে আছে—বেশি নহে, মাত্র পাঁচ হাজার। আমার চল্লিশ টাকা আয় হওয়া সত্ত্বেও ঐ পাঁচ হাজারে হস্তক্ষেপ করি নাই, তাহার কারণ আছে। নিজস্ব বাড়ি থাকার দরুন বাড়িভাড়া লাগে না, এবং সংসারে আমি ছাড়া উদ্‌বৃত্ত লোকের মধ্যে আমার একটি স্ত্রী আছেন। একটি ঝি আছে

বটে, কিন্তু তাহাকে মাহিনা দিতে হয় না, সে শিশুকাল হইতে আমাদের বাড়িতে থাকিয়া বৃদ্ধা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ঐ পাঁচ হাজারের কিঞ্চিৎ সুদ পাওয়া যায়।

কিন্তু আর ত অল্পে সুখী হওয়া চলে না, ঐ পাঁচ হাজার টাকায় যে-কোনো একটা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে, অধ্যবসায় থাকিলে উন্নতি অনিবার্য্য, ইহা আমি বিশ্বাস করি।

সন্ধ্যায় আমাদের একটা আড্ডা জমিত, একদিন সেখানেই কথাটি উত্থাপন করিলাম। কিন্তু আমাকে বেশি কথা উচ্চারণ করিতে হয় নাই, কেবল বলিয়াছিলাম, আমি একটা ব্যবসা করতে চাই। আড্ডায় আকাশ-পাতাল কত কি আলোচনা হইতেছিল—কিন্তু আমার কথা শুনিবামাত্র সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করিলেন, কিসের ব্যবসা?

সেটা এখনো ঠিক করিনি।

দীনবন্ধুবাবু বলিলেন, ব্যবসা যদি করতে চান ঘিয়ের ব্যবসা করুন, পাঁচশ টাকা ফেলতে পারলে লাল হয়ে যাবেন দুচার মাসের মধ্যে।

ভবতারণবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, না হে, অত সোজা নয়। পাঁচশ টাকায় যদি লাল হওয়া যেত, তা হ'লে আমার স্ত্রী লাল হ'ত সব্বার আগে। তাকে তিনশ টাকার হাওয়া বদল করিয়েছি, দুশ টাকার লিভার খাইয়েছি। কিন্তু এখনো শাদাই আছে।

আসল কথা ঘিয়ের ব্যবসায় জোচ্চুরি না করলে কিছু হয় না, কিন্তু জোচ্চুরি করতে হ'লে অভিজ্ঞতা দরকার। মাষ্টার মশাই জোচ্চুরির কি জানেন?

দীনবন্ধুবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, কখ্‌খনো নয়, জোচ্চুরি করবার দরকার নেই। মফঃস্বলে ঘিয়ের সের এক টাকা, কলকাতায়

দুটাকা, খরচা বাদে সেরে আট আনা, মণ পিছু বিশ টাকা। সোজা হিসাব।

ভবতারণবাবু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, সোজা হিসাব হ'লে আর কেউ তিরিশ টাকায় দশ ঘণ্টা কলম ঠেলত না।

দীনবন্ধুবাবু কেরানি। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

দেখিয়া ভবতারণবাবু বলিলেন, ব্যবসা করাও যেমন শক্ত, সে সম্বন্ধে কিছু বলাও তেমনি কঠিন। মাষ্টার মশাই, আমার একটি পরামর্শ শুনুন, আপনি ঘি ভুলে যান, ব্যবসা যদি করতে হয়, মাছের ব্যবসা করুন। ভোরে উঠে শিয়ালদ, ব্যস্। ভোরে উঠলেই টাকা। Early to bed—এই প্রবাদ বাক্যটি খুব সম্ভব একজন মৎস্য-ব্যবসায়ী বহুদিন আগে প্রচার করেছিলেন। গোয়ালন্দের মাছ, কষ্ট করেছে জেলেরা, কষ্ট করেছে কুলিরা, কষ্ট পেয়েছে মাছ, আপনার কোনো কষ্ট নেই, এ বিষয়ে আমার একটি প্ল্যান আছে।

নরেনবাবু বিড়িতে একটা টান মারিয়া ড্যাম-ইওর-মাছ বলিয়া কাছে আসিয়া বসিলেন।

ভবতারণবাবু নরেনবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন, মাছ ড্যাম কেন? মশাই মাছের কি জানেন?

দাঁতে বিড়ি চাপিয়া বিকৃতস্বরে নরেনবাবু জবাব দিলেন, মাছের আমি কি জানি? কিন্তু মশায়ের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি জানি সেটা মনে রাখবেন। আপনি মাছের যেটুকু চেনেন আমি তার চেয়ে বেশি চিনি মাছের খদ্দেরকে। মাছ এ যুগে অচল। ব্যবসা যদি করতে হয় সিনেমাই হচ্চে সব চেয়ে সেরা। দশ হাজার টাকা ছাড়ুন, লাখ টাকা উঠে আসবে এক মাসের মধ্যে। একটা লোক তার পরিবারের জন্যে মাসে ক টাকার মাছ কেনে? বড় জোর দশ টাকা। কিন্তু

একটা পরিবার মাসে সিনেমা দেখে—কি বল হে আশুতোষ—কত টাকার ?

আশুতোষ ভয়ানক সিনেমা-ভক্ত, সে ভাবিয়া বলিল, মাছের চেয়ে বেশি বটে।

ভূপতিবাবু কথা আরম্ভ করিলে কেহ কথা বলিবার ফুরসুৎ পায় না, কিন্তু তিনি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার আর তাঁহার চুপ করিয়া থাকা পোষাইল না—

আমার একটা অদ্ভূত প্লান আছে—মাছ সিনেমা ওসব বাজে, একেবারে বাজে।

আড্ডায় প্রায় পনের জন লোক উপস্থিত ছিল, এইবার তাহারা সকলে এক সঙ্গে কথা কহিয়া উঠিল, বোঝা গেল সকলেরই একটি করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্ল্যান আছে। আমাকে ঘিরিয়া লইয়া সকলে সমস্বরে নিজের নিজের প্ল্যান সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে দুই দিক হইতে দুইজন আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে, অন্যান্য সকলে হাত নাড়িয়া সম্মুখে পশ্চাতে গম্ভীর ভাবে আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে, আমি স্পষ্ট করিয়া কিছুই শুনিতে পাইতেছি না, সকল কথা মিলিয়া মিশিয়া যেটুকু মনে আছে তাহা এই—

মাছ হচ্চে লিজার্ডস্কিন দশ হাজার ফুট তুলে চার হাজার পোল্ট্রি ট্যানিং শিখতে আলু পটোল চিৎপুর বাজারে লণ্ড্রিতে ভীষণ চায়ের দোকান এই দেখ না ইনশিওর‍্যান্স ইণ্ডাষ্ট্রির চেয়ে শিমূল তুলো মার দিয়া কোল্ড ষ্টোরেজ ফ্রুট সিরাপ মাত্রেই ছাপাখানার ব্যাপারে ফুটবল ম্যানুফ্যাকচার আপটুডেট চিনির কলে কেমিষ্ট জোগাড় করতে :মাইকামাইন বিশেষ মনোহারি দোকানে মুরগীর চাষে কলের লাঙল জুড়ে

মাসিক পত্র চালানো সেণ্ট পার সেণ্ট তামাক পাতার খাবারের দোকান ঐ ত মুস্কিল—

মিলিত চীৎকারে কান ঝালাপালা হইয়া গেল, আমিও ঐ সঙ্গে চীৎকার সুরু করিলাম, ব্যবসা করব না, করব না, আপনারা থামুন, মলেও আর—

কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হয় না, অগত্যা আমি জোড় হাতে সকলকে নমস্কার করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইলাম। কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই, চারজন আমার সঙ্গে ক্রমাগত বকিতে বকিতে চলিল, আমি দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম, তাহারাও দৌড়াইতে লাগিল। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া তিনজন মধ্যপথ হইতে রণে ভঙ্গ দিল, মাত্র একজন থাকাতে অনেকটা সাহস পাইয়া দৌড়ান বন্ধ করিলাম। তখন সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল, আমার প্ল্যানটা—

তোমার মাথাটা—আমি ব্যবসা করব না।

সে কি হয়, ব্যবসার চেয়ে—

কি হে বিপিন !

চমকিয়া চাহিয়া দেখি আমার এক বন্ধু গাড়ি হইতে ডাকিতেছেন। গাড়ি কাছে আসিল ; বন্ধু আমার ভয়ার্ত্ত মুখ দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। আমি বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, আমাকে দেখে যতটা মনে করছ ততটা না হ'লেও খানিকটা বিপদে পড়েছি, কিন্তু মনে হচ্ছে বাঁচা গেল। চল তোমার সঙ্গে যেদিকে হোক খানিকটা যাওয়া যাক।

আমার সঙ্গে যিনি প্ল্যান আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। গাড়িতে উঠিয়া বন্ধুকে সংক্ষেপে বিপদের কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়ে

সত্যি বেঁচেছিস, যে-সব ব্যবসার কথা শুনলাম ওতে তোর সর্ব্বনাশ হ'ত, ব্যবসা সম্বন্ধে আমার একটা অদ্ভুত প্ল্যান আমি ঠিক করে রেখেছি, যদি লাগে তোর কাজেই লাগুক।

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, কতদূর এসেছি ?

হাওড়া ষ্টেশনের কাছে।

তা হ'লে থামাও, আমার একটা গুরুতর কাজে আছে, এক্ষুনি নামতে হবে, প্ল্যান অন্য দিন শুনব। গাড়ি থামিবামাত্র নামিয়া গেলাম। গাড়ি অদৃশ্য হইল, আমিও ট্রামে উ য়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে ঘুমটা ভালই হইয়াছিল, কিন্তু গোলমালে ভোরের বেলাই ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ফটক খুলিতেই দেখি পূর্ব্ব দিনের কয়েকজন এবং আরো নূতন কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে কোন্ ব্যবসা শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তুমুল তর্ক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র দুই তিন জন খপ্ করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল।

একজন বলিল, আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি আমার কথা যদি। আর একজন বাধা দিয়া বলিল, তোর গ্যারাণ্টির মূল্য কি ? আমার ঘড়ি বাজি রাখছি যদি আমার প্ল্যানে—

ইহার পর আর ইহাদের তর্ক অনুসরণ কবিতে পারি নাই, কেননা পূর্ব্বদিনের মত দশ-বারো জন সমস্বরে চীৎকার করিয়াছে।

আমি তর্কের মধ্যে ফস্ করিয়া উহাদের হাত ছাড়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, আমার হিতৈষীগণ চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

অন্যান্য দিন সাধারণত বেলা নয়টায় গঙ্গা-স্নান করি। সে দিন ভয়ে ভয়ে আটটায় স্নান করিতে গিয়াছি। জলে নামিয়া একটিমাত্র ডুব

দিয়াছি, আমার পাশে কে স্নান করিতেছিল পূর্ব্বে খেয়াল করি নাই ; ডুব দিয়া উঠিতেই সেই অপরিচিত লোকটি হঠাৎ বলিল, ও আপনি, ভাল কথা আপনি নাকি ব্যবসা করবেন ? আমাকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি—সে যা হোক, আপনি যদি টাকা নষ্ট করতে না চান তবে ইন্‌শিওর্যান্স—

আমি ভাল সাঁতার জানিতাম। ইন্‌শিওর্যান্সের কথা শেষ হইবার আগেই "ভগবান বাঁচাও" বলিয়া ডুবিয়া গেলাম। প্রায় এক মিনিট জলের ভিতর চলিয়া মাথা তুলিতেই দেখি আমার নিকট হইতে তিন হাত দূরে সেই লোকটিও মাথা তুলিল। প্রায় এক মিনিট দম বন্ধ করিবার পর তৎক্ষণাৎ আবার ডুব দেওয়া সম্ভব নহে, কাজেই নির্ব্বোধের মত তাহাব দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে একটু কাছে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমাদের কম্পানির নাম ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গল লাইফ, পলিসি কণ্ডিশানগুলো যদি—

কিন্তু যতই কষ্ট হউক, ইহার পর আমি আর মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার ডুবিয়া সেখান হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলাম ; তারপর যেমনি মাথা তুলিয়াছি দেখি ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গলও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র সে বলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের H. M. System—6 years' rating up—রিজার্ভের সঙ্গে লাইফ ফাণ্ডের অনুপাত—

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, বুঝতে চাই না।

ভদ্রলোক বাধা দিয়া বলিলেন, না বুঝে কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া উচিত নয়, আপনাকে বুঝতেই হবে।

"হে মধুসূদন" বলিয়া আবার ডুবিলাম। কিন্তু দশ সেকেণ্ডের মধ্যে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল। জলের ভিতর দিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া

চলিতে মাথায় কিসের সঙ্গে ভয়ানক গুঁতা লাগিয়া গেল। শুশুক মনে করিয়া ভয়ে তাড়াতাড়ি মাথা তুলিতেই দেখি, শুশুক নহে, ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গলের মাথা। মাথাটি যেন কথা বলিতে বলিতেই উঠিল,—শেষ পর্য্যন্ত ইনশিওর‍্যান্সে আপনাকে নামতেই হবে, এর থেকে পরিত্রাণ নেই।

কথাটা আমার অনেকটা বিশ্বাস হইল। বলিলাম, আপনার মত অধ্যবসায় ত আমার নেই।

বলেন কি, আপনার অধ্যবসায় যা দেখছি আমি ত তার কাছে শিশু। অল্প মূলধনে যদি ব্যবসা করতে হয়—

ব্যবসার কথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম। পরিত্রাণ পাইবার জন্য শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আবার ডুবিলাম। এবারে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া অপর পারের দিকে ছুটিতে লাগিলাম, পূরা এক মিনিট তীব্র বেগে ছুটিবার পর যখন উঠিলাম তখন দেখি আহিরীটোলা-ঘাটের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। ইন্‌ফ্যাণ্ট বেঙ্গল আমার গতি অনুমান করিতে না পারিয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে, না হইলে নিশ্চয় লাইফ ফাণ্ড কিংবা এক্স্‌পেন্স্‌ রেশিও সম্বন্ধে কথা তুলিত।

ভীষণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। পুনরায় সাঁতার দিয়া অপর পারে যাওয়া সম্ভব নহে। তীরে উঠিয়া ভিজা কাপড়ে জেটির দিকে চলিতে লাগিলাম। অবসন্ন দেহ, ধীরে ধীরে পা ফেলিতেছি, এমন সময় কে খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, কি বিপিনদা, একেবারে দেখতেই যে পাচ্ছেন না!

ইনি আমার শ্যালক।

আমি খুশী হইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না, গম্ভীর ভাবে

বলিলাম, ভাই, হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্চে—ওপার থেকে সাঁতার কেটে এসেছি, তোমার গায়ে একটু ভর দিয়ে চলি।

কোথায়?

ষ্টীমারের জেটিতে। সঙ্গে পয়সা নেই, একটা টিকিট কিনে দাও।

আমিও যে আপনার বাড়িতেই যাচ্ছি।

কি মনে ক'রে?

আজ এইমাত্র শুনলাম, আপনি চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছেন। যা-তা ব্যবসায় পয়সা নষ্ট না ক'রে চাকরি করাই কি ভাল নয়?

এইবার যথার্থ খুশী হইয়া বলিলাম, ব্যবসা আমি করব না, চাকরি বেঁচে থাক্।

যদি করতেন, তা হ'লে কিসের করতেন বলুন ত?

কিছু মনে করবার সময় পাইনি ভাই, মনে করব ব'লে মনে করছিলাম।

যদি নেহাৎই ব্যবসা করতে হয় তা হ'লে আমি একটি ভাল প্ল্যান—

তুমিও প্ল্যান? দেখ, আমার প্ল্যান-ট্যান কিছু দরকার নেই।

বলেন কি! ব্যবসার গোড়ার কথাই হচ্ছে প্ল্যান, যে ব্যবসা করবেন—

আমি বিনা প্ল্যানে ব্যবসা করব।

তা হয় না, আপনি একটা অসম্ভব কথা বললে আমি শুনব কেন? কিসের ব্যবসা করবেন, কত টাকা ফেলবেন, কিনে বেচা না ম্যানুফ্যাকচার, কমিশন এজেন্সি না আমদানি রপ্তানি, কত টাকা খাটবে, কত ব্যাঙ্কে থাকবে,—ধরুন যদি দশহাজার টাকা এষ্টিমেট

ক'রে থাকেন তাহ'লে প্রথমেই অন্তত পাঁচ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখা চাই, আরো বেশি রাখতে পারলে আরো ভাল হয়।

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, ভগবান!

শ্যালক তৎক্ষণাৎ বলিল, ভগবান প্রথম অবস্থায় কিছুই করেন না, ডাকতে হয় শেষ কালে ডাকবেন।

শ্যালকের মুখে বক্তৃতার খই ফুটিতে লাগিল, আমি নিরুপায়, ষ্টীমার হইতে লাফাইবার শক্তি নাই, চুপ করিয়া রহিলাম।

চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে ক্লান্তিবশত চোখ বুজিয়া আসিয়াছে—আধ-জাগ্রত অবস্থায় এক বিভীষিকা দেখিলাম। সমস্ত শালিখার লোক বাঁধাঘাটে আমাকে ষ্টীমার হইতে নামাইয়া লইবার জন্য আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি ঘাটে পৌঁছিবামাত্র হাজার হাজার লোক 'আমার প্ল্যান, আমার প্ল্যান' বলিয়া চীৎকার করিয়া চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার মধ্যে আমার স্ত্রীকেও দেখা যাইতেছে, সেও তাহার এক প্ল্যান লইয়া আসিয়াছে; আমাদের বৃদ্ধা ঝি তাহার পশ্চাতে 'পেলান পেলান' করিয়া চীৎকার সুরু করিয়াছে। তাহার দাঁত নাই এবং সেই জন্যই তাহার স্বর কোনো বাধা না পাইয়া সকলের স্বরকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। এইটুকু পর্য্যন্ত বেশ মনে আছে, ইহার পরের ঘটনা আর কিছু মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি, আমি হাঁসপাতালে শুইয়া এবং পাশে আমার স্ত্রী এবং শ্যালক বসিয়া। স্ত্রী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে এবং শ্যালক তাহাকে নানা রকম সান্ত্বনা দিতেছে।

হঠাৎ একটি শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। পাশের বিছানা ঘিরিয়া যাহারা বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কি আলোচনা হইতেছিল এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু কথার

ভাবে স্পষ্ট বোঝা গেল তাহাদের সমস্যা ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কোনো কথার অর্থগ্রহণ করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না। প্ল্যান কথাটি শুনিবামাত্র আবার উন্মাদ হইয়া উঠিলাম। উঠিয়া বসিলাম। মনে মনে তিন সেকেণ্ড পরিমাণ মোহ-মুদ্গর আওড়াইয়া দেখিলাম, হাতে পায়ে অনেকটা জোর ফিরিয়া আসিয়াছে। আমাকে জাগ্রত দেখিয়া শ্যালক হঠাৎ তাহার যাবতীয় দাঁত বাহির করিয়া বলিল, 'বপিন দা, আমার প্ল্যানটা তাহলে এবারে বলি?' আর থাকিতে পারিলাম না, বিছানা হইতে আচম্বিতে লাফ দিয়া উঠিয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

* * *

আজ সাত দিন হইল মামা-বাড়িতে লুকাইয়া আছি এবং আরো কিছুদিন থাকিব বলিয়া মনে করিতেছি। চাকরিটি থাকিবে না এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যবসা করিয়াই খাইতে হইবে কিন্তু সে ব্যবসা অন্য কাহারো প্ল্যানে নহে।

সেরূপ অবস্থা হইলে মৃত্যুর প্ল্যান চিন্তা করিতে হইবে।

অনুকম্পা

জন্মক্ষণ হইতেই আমার দুইজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং যাইবার সময় এমন কিছুই রাখিয়া গেলেন না যাহাতে অন্তত আমার শৈশবটাও নির্ব্বিবাদে কাটিতে পারে।

মামা এবং পিসিমা পালা করিয়া আমাকে মানুষ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তাঁহাদেরও শক্তির একটা সীমা ছিল। আমি যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি, তখন আমার প্রতিপালক এবং আমি উভয়েই মনে করিলাম আমরা পরস্পরকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছি। লজ্জা এবং সঙ্কোচ দুই দিক হইতেই কাটিয়া গেল। প্রতিপালক বলিলেন, হারাধন, এইবার ত পাস করিয়াছ, এখন পথ দেখ। আমিও মনে মনে ভাবিলাম, আমি ত ঠকাই নাই, সুতরাং যাইবার পূর্ব্বে আমার শেষ দাবীটি পেশ করিয়া যাই।

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও দুই পক্ষ হইতে আশীটি টাকার বেশি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। উহাই মাত্র সম্বল করিয়া মফঃস্বল হইতে কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। অফিসে অফিসে ঘুরিয়া আশা পূর্ণ হইল না। তিন-চারি মাসে সম্বল ফুরাইয়া আসিল। মূলধন যখন আশী হইতে পাঁচে আসিয়া পৌছিল, তখন আকাশের আলো যেন ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। আমি হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমি মরিতে বসিয়াছি এবং চারিদিক হইতে মৃত্যুর কালো ছায়া নামিয়া আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের জোর কমিয়া গেল, হাতের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া আসিল। জোরে কথা কহিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইল।

মামা-বাড়ি থাকিতে মামার এক আত্মীয়ের সঙ্গে সেখানে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে একটা বিস্ময়ের ভাব তখন হইতে আমার মনে ছিল। লোকটির ভয়ানক একটা ক্ষমতা আমি তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাঁহার পোষাকের পারিপাট্য, চালচলনের জাঁক, কথা বলিবার ভঙ্গি, সবই যেন ইতিহাসের কোনো নবাবকে মনে করাইয়া দিতেছিল। "ওহে ছোকরা, বাজার থেকে এক টিন সিগারেট কিনে আন ত।" তাঁহার নিকট হইতে এই আদেশটি পাইয়া একদা আমি ধন্য হইয়াছিলাম। এইটুকুই আমাদের পরিচয়।

পথে তাঁহার সঙ্গে এতদিন পরে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। আমাকে দেখিয়াই আমার পিঠে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, কি রে হারাধন, তুই কোত্থেকে? আমি আমার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিলাম। তিনি ত হাসিয়া অস্থির।

বলিস্ কি, অভাব ব'লে কোনো জিনিসকে তোর ত্রিসীমানায় আসতে দিবি না। অভাব ত আমাদের বাইরে নয়, অভাব মনে। মনের জোরে দুনিয়ায় সব হয়, ভুলে যা ভুলে যা, ওসব ভুলে যা। তোর মত একটা জোয়ান ছেলে, তোর লজ্জা করে না? তুই কি চাস্ বল, চাকরি? পঁচিশ-ত্রিশ টাকার চাকরির জন্যে দুই-তিন মাস ঘুরছিস্?

আমি ভগবানকে স্মরণ করিলাম। আমার দুর্ব্বলতা মূহূর্ত্তে ঘুচিয়া গেল। একটুখানি অনুকম্পার অভাবে শক্তি দূরের কথা, আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। আমি চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, আপনি আমাকে বাঁচালেন, আমার আর কোনো দুঃখ নেই।

চল, স্কয়ারে একটু বসি।

দুইজন একটি বেঞ্চিতে বসিলাম। তিনি আধঘণ্টা ধরিয়া আমার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিলেন। আমার শিরায় শিরায় রক্ত পাগল হইয়া ছুটিতে লাগিল, মনে এমন একটা শক্তি জাগিয়া উঠিল যে-শক্তি আমি নিজের মধ্যে কোনোদিন ছিল বলিয়া জানিতে পারি নাই।

তিনি "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" কথাটি অত্যন্ত জোর দিয়া উচ্চারণ করিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন, নিজের মনকে চালনা কর, প্রাণকে চালনা কর, দেহকে চালনা কর। আমার কাছে আগে বলতে হয়, চাকরি ক' গণ্ডা চাই? চাকরি খুঁজতে হয় না, আপনি এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ে। তুই আমাকে হাসালি! এইবার তবে উঠি, আর ভাল কথা, তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালই হ'য়েছে, দু আনার পয়সা দে ত।

আমি চট করিয়া পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলাম, ভাঙানি নেই, এইটেই রাখুন। উৎসাহের আতিশয্যে ঠিকানাটাও জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলাম।

তিনি টাকা লইয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, মনে জোর নিয়ে লেগে যা, চাকরি ঠিক মিলবে, পথে পথে কাঁদিস্ না, বুঝলি?

মার্কিন সিনেমা-সার

ভূমিকা

নীচের গল্পটি পড়িয়াই পাঠকের মনে হইবে কোনো ইংরেজি বই হইতে চুরি। কিন্তু কোন বই হইতে, তাহা বলিতে পারিবেন না। কারণ, কোনো পাঠকই ইংরেজি সকল বই পড়েন নাই। আবার যাঁহারা ইংরেজি বই মোটেই পড়েন না, কেবল সিনেমা দেখেন তাঁহারা মনে করিবেন, গল্পটি কোনো সিনেমা-ছবি হইতে চুরি; কিন্তু কোন সিনেমা-ছবি তাহা বলিতে পারিবেন না।

আমি নিজে কিছুই বলিতে চাহি না, অথচ পাঠকদিগকে ঠকাইবার প্রবৃত্তিও নাই। চুরি করিয়াছি বটে, কিন্তু কোনো একখানা বই বা ছবি হইতে নহে। বই হইতে বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে, আমি সিনেমা-ছবি হইতেই গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু কোন কোন ছবি হইতে তাহা আমার স্মরণ নাই।

পাঠকেরা অনেকেই অঙ্কশাস্ত্রে জী. সী. এম. করিয়াছেন, এবং আশা করি কেহ কেহ তাহা অদ্যাবধি মনেও রাখিয়াছেন। আমার এই গল্পটিও যাবতীয় সিনেমা-গল্পের জী. সী. এম। ইহাতে প্রায় সবই আছে। সকল সিনেমা-ছবিতেই যে একটি common factor থাকে তাহা ইহাতে আছে, কেবল গল্পটি নাই। কিন্তু গল্প দেখিতে ত আমরা সিনেমায় যাই না। দেখিতে যাই ঘাত এবং প্রতিঘাত। সিনেমায় যদি বিবাহ আগে হয় তাহা হইলে সে বিবাহ সুখের হয় না। আবার যদি বিবাহ পরে হয় তাহা হইলে ছবিখানি মিলনান্ত হইয়া

পড়ে, সমঝদার খুশী হয় না। বিবাহ মোটেই হইল না অথচ চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়া গেল, এই ধরণের গল্পে দর্শকের চোখে জল আসে। দেড় ঘণ্টার ছবির মধ্যে আধ ঘণ্টা যদি নায়ক-নায়িকার চুম্বনেই কাটে তাহা হইলে ত কথাই নাই। কেননা চুম্বন কোনো অবস্থাতেই মিলনের ইঙ্গিত নহে, উহা একটি রহস্যময় ঘটনা। উহা যে কিসের ইঙ্গিত তাহা বুঝা যায় না। নায়কের আকর্ষণে নায়িকা কাছে আসে, উভয়ে উভয়ের জন্য উন্মাদ হয়, নায়িকা যথারীতি ঘাড় উঁচু করিয়া মুখ বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু নায়ক যে মুহূর্ত্তে নায়িকাকে চুম্বন করে সেই মুহূর্ত্তে নায়িকার যাবতীয় স্মৃতিমূলক দুঃখ বুকের ভিতর উথলিয়া উঠে; তখন হয় সে ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে না হয় বলে, "How dare you?" নায়ক তখন নির্ব্বোধের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার দিকে তাকায়, সাধ্যসাধনা করে, কিন্তু নায়িকা ততক্ষণে পাথর হইয়া গিয়াছে, কোনো সাড়া দেয় না। নায়ক হতাশ হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু চলিয়া যাইবামাত্র নায়িকার স্বপ্নভঙ্গ হয়। নায়ককে পাইবার জন্য তখন সে অস্থির হইয়া ওঠে, এবং তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু চুম্বনের পূর্ব্বেই যদি দৈবক্রমে নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ হইয়া যায় তাহা হইলে নায়ককে আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট অপরাধী হিসাবে কিংবা শত্রুহস্তে বন্দী অবস্থায় দেখি। গভর্ণমেণ্ট যখন ভুল বুঝিতে পারে তখনই গল্প শেষ হইয়া যায়। শেষ দৃশ্যের চুম্বন গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করে।

দুষ্ট লোকের শত্রুতাও গল্পকে বিশেষ পুষ্ট করে। নায়ক শত্রুর হস্তে পড়িয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কতকগুলি লোক ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া নায়ককে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু এগুলি শুধু বৈচিত্র্য হিসাবেই দেখি, গল্পের মূলে পৌঁছিতে হইলে এসব

অগ্রাহ্য করিতে হইবে। নায়ক-নায়িকা উভয়ে যতক্ষণ উভয়কে পাইবার জন্য ব্যাকুল, অর্থাৎ আকর্ষণ যতক্ষণ প্রবল ততক্ষণ প্রকৃতির কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মে উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ চলিতে থাকে তাহা বুঝা যায় না। এবং বুঝা যায় না বলিয়াই সিনেমার আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িতেছে। আকর্ষণের একটি বিশেষ কারণ এই যে সিনেমায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে যে ঘটনা-পারম্পর্য্য থাকে তাহাকে এরূপ অবশ্যম্ভাবী বা inevitable করিয়া তোলা হয় যে মানুষের জীবনে সিনেমাসুলভ ঘটনাকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয়। টাইপিষ্ট বা পরিচারিকা এই সিনেমার অনিবার্য্য রীতিতে পড়িয়া লক্ষপতির গৃহিণী হইতেছে, পথের ভিখারী রাজা হইতেছে, অপরিচিত নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবামাত্র গভীর প্রেমে পড়িয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, অথবা হতাশ হইয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিতেছে। ইহাই ত সত্যকার জীবন।

জীবনে যে ঘটনা আজ আরম্ভ হইল তাহার পরিণতি কত দিনে দেখা যাইবে তাহা কেহ জানে না। আবার যে পরিণতি দেখা যাইতেছে তাহার আরম্ভ কবে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া রাখা দায়। সত্যকার জীবনে জীবনকে জানিবার এই অসুবিধা সিনেমা দূর করিয়াছে। সন্ধ্যা ছয়টায় যাহা আরম্ভ হইল রাত্রি আটটায় তাহার পরিণতি অবশ্যই দেখা যাইবে; এতটা নির্ভরতা আমরা প্রিয়তমের নিকট হইতেও আশা করি না।

প্রথম জীবনে সিনেমার সুখে সুখী হইয়াছি এবং সিনেমার দুঃখে বহু অশ্রুপাত করিয়াছি। এখনও অভ্যাসবশত সিনেমায় যাই বটে, কিন্তু তাহা সুখ বা দুঃখ অনুভব করিবার জন্য নহে, সন্ধ্যাটা কাটাইবার জন্য। জীবন-সন্ধ্যা যেমন মানুষের মনে একটা নৈরাশ্য আনিয়া দেয়,

দিন-শেষের সন্ধ্যাও তেমনি মনের উপর নিরাশার ছায়াপাত করে। ইহাই ত ছায়াচিত্র দেখিবার উপযুক্ত সময়। সমস্ত দিনের হিসাব মিলিয়া গেলে সময়ের উপর আর কোনো মায়া থাকে না। বৃদ্ধেরা পশ্চাৎ দিকে চাহিলেই সমস্ত জীবনটা একসঙ্গে দেখিতে পায়। কিন্তু জীবনে যদি কিছু অদৃশ্য অংশ না থাকে তাহা হইলে আশা করিবার, বিশ্বাস করিবার কিছুই থাকে না, অর্থাৎ জীবনের রহস্যটাই চলিয়া যায়; থাকে শুধু হরিনাম। সিনেমা দিন-শেষের হরিনাম।

অর্থাৎ ইহাতে সুখও নাই দুঃখও নাই, যদি কিছু থাকে তবে তাহা বিরক্তি। কিন্তু বিরক্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। মনের রহস্য যাহাদের আর ভাল লাগে না, তাহারা সাইকো-অ্যানালিসিস করে: বিশ্ব-পৃথিবীকে যাহারা ভালবাসিতে পারিতেছে না তাহারাই ইহাকে ধাঁধা আখ্যা দিয়া ধাঁধার উত্তর দিবার কাজে লাগিয়াছে। ইহারাই বৈজ্ঞানিক। আমিও এখন সিনেমার টেকনিক বিশ্লেষণ করিতেছি। এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই নিম্নলিখিত গল্পটি প্রস্তুত করিয়াছি। গল্পটি Made in India, কিন্তু ইহার অংশগুলি হলিউড হইতে সংগৃহীত। আমি assemble করিয়াছি। একই গল্প বিভিন্ন পোষাকে আজ সাত বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি। আমার গল্পে এই সাত বৎসরের দেখা গল্পসমূহের সার প্রস্তুত করিয়াছি মাত্র। বলা বাহুল্য, গল্প সম্পর্কে ইহা নিতান্তই অসার।

গল্প

বেলিংহাম গ্রামের লোকদের মধ্যে অস্বাভাবিক চঞ্চলতা দেখা যাইতেছে। গ্রামের যে কয়েকটি যুবক যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদের

অধিকাংশেরই মৃত্যু হইয়াছে, মাত্র একজন কি দুইজন এখনও জীবিত আছে।

বেলিংহাম ইংলণ্ডের উত্তরে নর্দাম্বারল্যাণ্ড জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত একটি গির্জা আজিও এই গ্রামে বিরাজ করিতেছে। এই গির্জাঘরে গ্রামের বৃদ্ধেরা জুটিয়া যাহাতে জীবিতেরা জীবিত থাকে, মৃতেরা সদ্গতিলাভ করে এবং শত্রুপক্ষ হারিয়া যায় সেই মর্ম্মে প্রত্যহ প্রার্থনা করে।

এই গ্রাম হইতে হ্যারি নামক তেইশ বৎসরের একটি দরিদ্র যুবক ১৯১৪ সালে যুদ্ধে গিয়াছে, আজ তাহার বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর হইয়াছে, আজিও সে ফেরে নাই, এখনও তাহাকে জার্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইতেছে।

বেলিংহামের নামকরা কয়লার ব্যবসায়ী উইলিয়াম কেম্প তাঁহার দুই পুত্রকে মহাযুদ্ধে হারাইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা লুসিকে লইয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন। এই লুসির সঙ্গে হ্যারির কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু লুসির পিতা দরিদ্র হ্যারিকে আমল দেন নাই, এবং কন্যাকে তাহার সহিত মিশিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু নদীর বেগ কেহ বাঁধ দিয়া ঠেকাইতে পারে না। বাধা পাইলে নদী সেখানে প্রথমত ঘোর আবর্ত্ত সৃষ্টি করে, পরে হয় সে বাধা ভাঙিয়া ফেলে, না হয় অন্য পথ কাটিয়া চলে। লুসিও পিতার দিক হইতে বাধা পাইয়া থামিয়া থাকে নাই। সে তাহার তরুণী হৃদয়ের সমস্ত আবেগ লইয়া নূতন পথে প্রতিবেশী রবিন্‌সনের দিকে ছুটিয়াছিল। কিন্তু রবিন্‌সনও যুদ্ধে চলিয়া গেল। মহাযুদ্ধের আহ্বান, মহাকালের আহ্বান, মানুষের ক্ষমতা তাহার কাছে হার মানিতে বাধ্য।

এই সময় দেশের মধ্যে একটা নূতন ভাবের স্রোত বহিতেছিল।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার ব্যবধানবোধ সকলের মন হইতেই ঘুচিতে আরম্ভ করিয়াছে। জগৎ অনিত্য, কিছুই স্থির নহে, সমস্ত মায়া, এই সত্যটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মনকেই আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। যখন তখন আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিতেছে, দলে দলে নূতন লোক যুদ্ধে যাইবার জন্য নাম লিখাইতেছে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া জীবনটাকে ফানুসের মত আকাশে উড়াইয়া দিতেছে। জীবন লইয়া খেলা ; লক্ষ লক্ষ প্রাণ হওয়ায় ছড়াইয়া দেওয়ার খেলা।

রবিন্‌সনের মৃত্যুসংবাদ আসিল। মৃত্যুসংবাদে নূতনত্ব নাই। একটি সন্তানের মৃত্যুর জন্য একটি পিতা বা একটি মাতার পৃথক ভাবে কাঁদিবার দরকার হয় নাই। য়ুরোপের সকল সন্তানের জন্য সকল পিতামাতা সমগ্রভাবে কাঁদিতেছে।

রবিন্‌সন মরিল। লুসিও তৎক্ষণাৎ হ্যারির স্মৃতিটি নূতন করিয়া মনের মধ্যে ঝালাইয়া লইল। হ্যারির পরিত্যক্ত ফোটোখানা লকেটের ভিতর আশ্রয় পাইয়া আবার তাহার বুকে দুলিল। যুদ্ধের কঠিন ধাক্কায় ধনীদরিদ্র-বোধ সকলের মন হইতেই ঘুচিয়া গিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধশেষে যদি হ্যারি প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে তবে লুসির সঙ্গে তাহার মিলন ঘটিতে অন্তত লুসির পিতার দিক হইতে আর কোনো বাধা থাকিবে না। হ্যারি নিরাপদে ফিরিয়া আসুক, তাঁহার মন দিবারাত্র এই প্রার্থনাই করিতেছিল। না আসিলে কি উপায় হইবে ? বহু বর্গমাইলের মধ্যে লুসিকে বিবাহ করিতে পারে এরূপ যুবক কেহ জীবিত ছিল না।

ইতিমধ্যে আমরা মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায় দেখিতেছি। ফ্লাণ্ডার্স হইতে জার্ম্মানগণ হটিয়া যাইতেছে। হ্যারি প্রকৃত বীরের মত যুদ্ধ করিতেছে। চারিদিকে সৈন্যগণ কেহ মরিতেছে, কেহ আহত

হইতেছে, কেহ আর্ত্তনাদ করিতেছে, কিন্তু হ্যারি অক্ষতদেহে দৃঢ়চিত্তে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মেশীন গান ছুঁড়িতেছে। চারিদিকে অন্ধকার, বজ্রের ন্যায় কামানের গোলা শূন্যে ফাটিয়া মাঝে মাঝে সেই অন্ধকারের বুক আলোকিত করিতেছে। সেই আলোর দীপ্তিতে আমরা হ্যারির অমানুষিক বীরত্ব উপভোগ করিতেছি। জার্ম্মানগণ বিরামহীন মেশীন গানের সম্মুখে টিকিতে পারিল না, এবং এই পরাজয়ের ফলে তাহারা St. Quentin ফরাসীদিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল।

আমরা গল্পের প্রারম্ভে দেখিয়াছিলাম লুসি হ্যারির ফোটো আবার লকেটে স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে কত কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা দেখিবার অবসর পাই নাই। য়ুরোপ এমন একটি অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যখন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে এক একটি যুগান্তর ঘটিয়া যাইতেছে। লুসিকে আমরা বেলজিয়ামের একটি গ্রামে নার্স অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি। একা উদ্বেগপূর্ণ মনে চতুর্দ্দিকের একটা অস্থিরতার মধ্যে প্রতিনিয়ত বাস করার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া নার্সের কাজ করা ঢের সহজ। লুসি, মনের সহিত এবং পিতামাতার সহিত অনেক দ্বন্দ্ব করিয়া রিক্রুটিং অফিসারের সহায়তায় শেষ পর্য্যন্ত সেবাধর্ম্মই গ্রহণ করিল। রবিন্‌সন নাই। দেশে আর কেহই নাই। লুসি কাহার আশায় থাকিবে? হ্যারি এখনও জীবিত। হ্যারি দরিদ্র কিন্তু সে শুধু লুসির পিতার কাছে। তবে হ্যারির যুদ্ধখ্যাতি লুসির পিতার কাছেও পৌঁছিয়াছিল, এবং তিনিও শেষে হ্যারির প্রশংসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই প্রশংসাই লুসির মনে সহসা নূতন করিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। বিশেষত যুদ্ধক্ষেত্রে ধনীদরিদ্র ভেদ নাই, সকলেরই এক পোষাক, এক কর্ত্তব্য।

লুসি সত্যিই সিষ্টার হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার চেহারার মধ্যে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। একান্ত নিষ্ঠার সহিত সে আহত সৈনিকগণকে সেবা করিতেছে; সে যেন বহুকালের অভ্যস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা, কে বলিবে সে মাত্র পনেরো দিন হইল নূতন জীবন গ্রহণ করিয়াছে। বহিরাবরণ শুভ্র হইলেও লুসির অন্তরে উদ্দীপনার রক্তিমা। এই উদ্দীপনা না থাকিলে কেহ কোনো প্রেরণা লাভ করে না। নার্সের কাজ সহজ নহে। নির্ব্বিকার চিত্তে আহতের আর্ত্তনাদ সহ্য করিতে হয়। চারিদিকে বিকৃত এবং বিকলাঙ্গ মানুষের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিতে হয়, মনকে কঠিন করিয়া না রাখিলে চলে না।

লুসি অবসর পাইলেই হ্যারির ফোটোর লকেটখানা খুলিয়া দেখে, আপনার মনে কি ভাবে, ছবিটাকে চুম্বন করে, একবার লকেট বন্ধ করে কিন্তু আবার খোলে, আবার চোখের জলে লকেট ভিজিয়া যায়, আবার তখনই চোখ মুছিয়া রোগীকে ঔষধ খাওয়াইতে যায়।

হ্যারিদের দলের একটি যুদ্ধ শেষ হইয়া তাহারা একটি শহরে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। ফরাসী হোটেল। মদ আর স্ত্রীলোকের মধ্যে সৈন্যগণ বেপরোয়া স্ফূর্ত্তি চালাইতেছে। নাচিতেছে, গাহিতেছে, মারামারি করিতেছে। হ্যারি যে মেয়েটির সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেছে, সে মেয়েটি অল্প ইংরেজি জানে। তাহার মুখে একটা লাবণ্য এবং একটা বুদ্ধির ঔজ্জল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার নাম লী। অদূরে বাজনা বাজিতেছে। কি একটা সুর বাজিতেই লী হ্যারির হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। সুরের সঙ্গে তাহার নাচিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। লী গান ধরিয়া দিল এবং হ্যারিকে লইয়া নাচিতে

লাগিল। হ্যারি লীর মুখের দিকে চাহিয়া নাচিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার নাচ থামিয়া গেল। সে লীর চোখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। লী সে দৃষ্টির প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না। দুইজনে একটা মাদকতায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দুইজনেই দুইজনের মধ্যে যেন একটা জন্মান্তরের সম্বন্ধ আবিষ্কার করিল। যেন উভয়ে বহু জন্ম ধরিয়া উভয়কে চেনে। এই উপলব্ধির মুহূর্ত্তে বাহিরের জগৎ তাহাদের কাছে লুপ্ত হইয়া গেল। দুইজনে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া চুম্বনের মধ্যে সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ডুবাইয়া দিল। সমস্ত চঞ্চল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দুইটি স্তব্ধ প্রাণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—সে কি মহিমাময় দৃশ্য !

কিন্তু স্ত্রীলোকের মন রহস্যময়। এই মুহূর্ত্তে তাহার কি এক স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এত দিন নাচ গান ও আত্মবিক্রয়ের সহস্র মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে পার হইয়া যাইবার সময় ত এই স্মৃতি তাহার মনে জাগে নাই ! এখন কেন জাগিল ? তাহার উত্তর লী দিতে পারে না, কিন্তু তাহার চোখে জল আসিল। হ্যারি টেবিল হইতে মদের গ্লাসটি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, লী, আমাকে ক্ষমা কর, আমি কি অজ্ঞাতসারে তোমাকে আঘাত দিয়াছি ? কোনো পুরাতন স্মৃতি, কোনো অতীত দুঃখ কি তোমার মনে জাগিয়াছে ? বল, লী, বল—আমি যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।

কিন্তু লী কোনো কথাই বলিল না। টপ টপ করিয়া তাহার অশ্রু মদের গ্লাসে পড়িতে লাগিল। তারপর হঠাৎ গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখিয়া লী বাহির হইয়া গেল। হ্যারি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল সেখানে অপেক্ষা করিয়া পরক্ষণেই লীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া হ্যারি লীকে ধরিয়া ফেলিল, এবং আবেগভরে

বলিল, লী, আমাকে কঠিন শাস্তি দাও, কিন্তু এরূপভাবে কথা না বলিয়া চলিয়া যাইও না।

লী তথাপি নিরুত্তর। হ্যারির সহ্যের সীমা ভাঙিল। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এমন সময় দূরে সৈন্যদের স্থানত্যাগের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। হ্যারির বুক সেই বাদ্যের তালে তালে ফুলিতে লাগিল। আর মাত্র এক মিনিট সময়। হ্যারি ঘড়ি দেখিল। ঘর হইতে সৈন্যগণ বাহির হইতেছে। তাহাদের কাহারও হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকেরাও বাহিরে আসিয়াছে, সকলেই বিদায় চুম্বনে মত্ত হইয়াছে, কিন্তু হ্যারির জীবন মরুভূমি। লী এখনও তাহার নীরবতা ভঙ্গ করে নাই। পাশেই একটা ছোট গাছ ছিল, অগত্যা হ্যারি তাহার পাতাগুলি টানিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি লীর মৌনব্রত ভঙ্গ হইল না। হ্যারি গাছের শেষ পাতাটি ছিঁড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল, নিষ্ঠুর!—তার পরই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

লীর যেন হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ হইল। চারিদিকে উন্মত্তের মত চাহিল, দেখিল হ্যারি নাই। সেখান হইতে সৈন্যদের লাইন ধরিয়া ছুটিতে লাগিল, প্রত্যেক সৈনিকের মুখের দিকে ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু কোথায় হ্যারি?

মার্চ সঙ্গীত বাজিতেছে। লীর যেন মনে হইতেছে তাহারই অন্তর ভেদ করিয়া বিদায়-বাদ্য বাজিতেছে। স্ত্রীলোক হইয়া সে কত সহ্য করিবে! লী আর দৌড়াইতে পারিল না, পথের ধারে বসিয়া পড়িল। তাহার বুকের মধ্যে তখন মহাসমুদ্রের ঢেউ ভাঙিতেছে। কতক্ষণ লী সেখানে বসিয়াছিল তাহা তাহার খেয়াল নাই। যখন উঠিল তখন চারিধারে কেহ নাই, লী একা সেই জন-বিরল মাঠে রাত্রির অন্ধকারের মতই অন্ধকার দৃষ্টি লইয়া পথ চলিতে লাগিল।

লী এক পা এক পা করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিল। বেদনাভারে মাথা নীচু হইয়া গিয়াছে, চোখ হইতে অশ্রুর স্রোত বহিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে টেবিলটিতে তাহারা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বসিয়াছিল সেই-খানে আসিয়া লী কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে মদের গ্লাসটি তুলিয়া লইয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর সেটাকে চুম্বন করিল, তারপর সেটাকে লইয়া ধীরে ধীরে ঘরে গেল। লী হোটেলেই থাকে, হোটেলের ক্রেতাকে সে গান গাহিয়া খুশী করে, মাহিনা পায় একশত ফ্র্যাঙ্ক।

ইহারই মধ্যে আমরা এক মাস পার হইয়া আসিলাম। পার হইতে মুহূর্ত্তকাল লাগিল। কিন্তু এই মুহূর্ত্তকালের মধ্যে কি আমরা অন্য কিছুতে দৃষ্টিপাত করি নাই? করিয়াছি। আমরা ইত্যবসরে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা দেখিয়াছি। অবিশ্রান্ত কামানের গর্জ্জন, ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, জল পাঁক, কাঁটা তার, মেশীন গানের গুলি, এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া সৈন্যদের যুদ্ধ কৌশল দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথে বিদ্যুতের ঝলকের মত ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; দলে দলে লোকের প্রাণ বিসর্জ্জন দেখিয়াছি; মৃত্যুযন্ত্রণার মর্ম্মভেদী হাহাকার শুনিয়াছি; তারপর হঠাৎ যুদ্ধের সমস্ত কোলাহল এবং দৃশ্য চোখের সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দেখা গেল, প্রকাণ্ড একটা বাড়ি সাময়িক ভাবে হাসপাতালে পরিণত করা হইয়াছে। রোগীর শয্যাগুলি পর পর চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। যুদ্ধের আহত সৈনিকগণ কাহারো হাতে কাহারো পায়ে কাহারো মাথায়

কাহারো বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পর পর শুইয়া আছে। নার্সগণ অতি তৎপরতার সহিত রোগীদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি রোগী আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহার প্রবল জ্বর ও বিকার, খুব সম্ভব ক্ষতস্থান সেপটিক হইয়াছে। পাশে নার্স তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে, ইহারই মধ্যে নার্স একবার তাহার উত্তপ্ত কপালে নিজের মুখখানি রাখিল, কিন্তু অসহ্য উত্তাপে বেশিক্ষণ রাখিতে পারিল না। বলা বাহুল্য রোগীটি হ্যারি এবং নার্সটি লুসি। লুসির চোখে ক্ষণে ক্ষণে জল দেখা যাইতে লাগিল। শত শত আর্ত্ত রোগীর সান্ত্বনা লুসি, সেই লুসির আজ সান্ত্বনা নাই। লুসি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল। মনে মনেই বলিল, হ্যারি, হ্যারি, তোমারই জন্য আমি আজ পিতামাতাকে, দেশকে, ত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে অপরিচিত লোকজনের মধ্যে বাস করিতে আসিয়াছি—তুমি ফিরিয়া চাও। তোমারই জন্য আজ আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী—

হঠাৎ লুসির মনে স্বর্গীয় আলো জ্বলিয়া উঠিল। সে সন্ন্যাসিনী এই কথাটি স্মরণ করিতেই তাহার বিবেক তাহাকে কশাঘাত করিল। সন্ন্যাসিনী ?—তাহা হইলে এই মোহ কেন ? মায়া কেন ? না—ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। সন্ন্যাসিনী, লুসি সন্ন্যাসিনী। ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। লুসি সন্ন্যাসিনীই হইবে, মায়া, মোহ, আসক্তি মন হইতে দূর করিয়া দিবে। লুসির মনে জোর আসিল, তাহার নয়ন-কোণে স্বর্গীয় হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। লুসির চোখে হ্যারিতে আর অন্য রোগীতে কোনো ভেদ রহিল না। সে প্রাণপণে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল।

আহত সৈনিকদের মধ্যে কেহ মরিল, কেহ আরোগ্য লাভ করিল ;

হ্যারিও যথাসময়ে আরোগ্য লাভ করিল। প্রথম জ্ঞান হইতেই সে সেবা-রতা লুসিকে দেখিল কিন্তু চিনিতে পারিল না। তাহার পাঁচ বৎসরের স্মৃতি যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। আর, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের হাসপাতালে তাহার বাল্যসখী লুসি আসিতে পারে ইহা তাহার কল্পনার অতীত। হ্যারি বিহ্বলনেত্রে লুসির দিকে চাহিয়া থাকে। লুসি তাহার দৃষ্টিপথ হইতে নিজেকে সরাইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। কিন্তু কতক্ষণ? কর্ত্তব্য তাহাকে করিতেই হয়—তাহাকে সকলের নিকটেই যাইতে হয়।

হ্যারি লুসিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, তুমি কে? লুসি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, বেশী কথা বলিও না, ঔষধটি খাও। কিন্তু হঠাৎ হ্যারি তাহাকে চিনিতে পারিল। বলিল, তুমি লুসি—তোমাকে চিনিয়াছি। লুসি বলিল, আমি সন্ন্যাসিনী।

হ্যারি নাছোড়; সে তথাপি বলিল, না-না, তুমি লুসি, আমার লুসি।

এখন আর নই, এখন আমি সন্ন্যাসিনী।

হ্যারি আনন্দে প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল। তারপর লুসির হাত ধরিয়া বলিল, লুসি, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে তুমি আমার।

লুসি হাত ছাড়াইয়া লইল। আবার দ্বন্দ্ব! মনের সঙ্গে হৃদয়ের, বিবেকের সঙ্গে প্রবৃত্তির। লুসি নিরপেক্ষ দর্শক। যে জয়লাভ করে লুসি তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিবে। লুসি হ্যারিকে জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। তিন দিন দ্বন্দ্ব চলিল, চতুর্থ দিনে দেখা গেল বিবেকই জয়লাভ করিয়াছে। লুসি স্থির করিল, ভগবানের আদেশে তাহাকে সন্ন্যাসিনী থাকিতে হইবে, অন্য পথ নাই।

এই চারিদিনের মধ্যে হ্যারিও সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের বাহিরে লুসি ও

হ্যারির সাক্ষাৎ হইয়াছে। হ্যারি বলিতেছে, লুসি, লুসি, তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছ, আবার কি আমাকে মৃত্যুর পথে ফেলিয়া যাইবে? চল আমরা দেশে ফিরিয়া যাই; আমরা নূতন সংসার পাতিয়া নবজীবনের উদ্বোধন করি।

লুসি নিরুত্তর। তাহার মুখ এতক্ষণ নীচের দিকে ছিল, এখন তাহা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল। হ্যারি শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

হ্যারি মাটিতে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। তাহার উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছে। উত্তেজনায় ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না। তবু দুই হাতের মুঠায় খানিকটা করিয়া মাটি প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, লুসি, একটা কথা বল।

লুসির মুখ সম্পূর্ণ আকাশের দিকে ফিরিল। অন্ধকার আকাশ হইতে একটা জ্যোতি লুসির মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া ভ্রম হইতেছে। কিন্তু হ্যারি এত সহজে পৃথিবীর ধর্ম্ম ছাড়িতে পারে না। সে তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা লইয়া দুঃখে এবং ক্ষোভে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর হাতের মুঠা হইতে মাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উত্তেজিত ভাবে হাসপাতালের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

লুসি একই ভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সমস্ত দেহ মন ঝিম ঝিম করিতেছে—নড়িবার শক্তিও যেন নাই। হঠাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বপৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সেখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পরদিনই লুসি অসুস্থতার জন্য ছুটির আবেদন করিয়াছে। তাহার দেহ মন ভাঙিয়া পড়িয়াছে—কোনো কাজই সে আর করিতে পারে না, কেবল ভগবানের আদেশে বাঁচিয়া আছে মাত্র। এই হাসপাতালে থাকিলে যে তাহার আর উদ্ধার নাই ইহাও সে বুঝিয়াছে—সুতরাং তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতেই হইবে। যথাসময়ে ছুটি মঞ্জুর হইল। তাহার স্থানে নূতন নার্স আসিল। লুসি তাহাকে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার এখনও সকল কাজ শেষ হয় নাই। তাহার ইচ্ছা হইল যাইবার সময় একবার সে হ্যারিকে দেখিবে এবং তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। মনকে দৃঢ় করিয়া, ভগবানকে বার বার স্মরণ করিয়া সন্ধ্যায় সে হ্যারির নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রথমে ভাবিয়াছিল, তাহাকে না দেখিয়া যাইবে, কিন্তু বিবেক কিছুতেই তাহা করিতে দিল না।

লুসি বুঝিতে পারিয়াছিল সে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা সহজ নহে। হ্যারির পরিচয় সে জানে। যে তাহাকে সাধ্যসাধনা করিয়া পায় নাই তাহারই নিকট সে বিদায় লইতে যাইতেছে! ইহা হ্যারির পক্ষেও যেমন অসহ্য লুসির পক্ষেও তেমনি! কিন্তু তবু লুসি হ্যারির কথা ভুলিয়া নিজের কর্ত্তব্যবোধটাকেই বড় করিয়া দেখিতে চায়। নিজের ক্ষমতার প্রতি তাহার যে একটা অসীম বিশ্বাস ছিল তাহা ত সেদিন ভাঙিয়া গিয়াছে। হ্যারিকে অগ্রাহ্য করিয়া তাড়াইয়া দিয়া সে ত স্থির থাকিতে পারে নাই, মাথা ঘুরিয়াছিল, পা কাঁপিয়াছিল, মূর্চ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তবু লুসি নিজেকে বার বার কঠিন পরীক্ষা করিতে চায়। ইহা তাহার একটি দাম্ভিকতা।

ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে লুসি হ্যারির নিকট রওনা হইল। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবামাত্র তাহার এ কি হইল? মনের জগতে যে

একটা প্রচণ্ড প্রলয় ঘটিয়া গেল! ইহার জন্য ত লুসি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। লুসি দেখিল, নূতন নার্স হ্যারিকে চুম্বন করিতেছে, আর বলিতেছে, প্রিয়তম, তোমারই জন্য এতকাল আমি সন্ন্যাসিনীর মত পথে পথে ঘুরিয়াছি।

হ্যারি লুসিকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, লুসি, এখনও বল— কিন্তু লুসি কিছুই বলিল না, তাহার বিবেক তাহাকে বলিতে দিল না। বলিতে দিল না বটে কিন্তু তাহার হাতের উপর বিবেকের কোনো প্রভাব ছিল না—লুসি বিদ্যুৎবেগে টেবিল হইতে মালিসের ঔষধের শিশিটি লইয়া ঢক ঢক করিয়া খানিকটা বিষ গিলিয়া ফেলিল। হ্যারি বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লুসি লুসি করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার হাত হইতে বিষের শিশিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের মুখে খানিকটা ঢালিয়া দিল।

সমস্ত হাসপাতালময় কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই ব্যস্ত হইয়া তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নূতন নার্স, হ্যারি, হ্যারি, বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার হাত হইতে শিশিটি ছিনাইয়া লইয়া বাকী বিষটুকু মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ শোচনীয় মৃত্যু কেহ দেখে না, সেজন্য সকলেই ইহা দেখিয়া ভীত হইল। কিন্তু যথারীতি চেষ্টা সত্ত্বেও উহাদের কেহ বাঁচিল না।

ক্ষণকাল পরেই দেখা গেল, তিনটি প্রেতাত্মা শূন্যপথে চলিতেছে। প্রথম চলিতেছে লুসি। তাহার দুইখানা হাত এবং দৃষ্টি স্বর্গের দিকে, মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে—ঈশ্বর—ঈশ্বর। লুসির পশ্চাতে চলিতেছে হ্যারি। তাহার দুই খানা হাত ও দৃষ্টি লুসির দিকে—মুখ

হইতে ক্রমাগত লুসি লুসি ধ্বনি বাহির হইতেছে। হ্যারির পশ্চাতে চলিতেছে নূতন নার্স। সে অবিরাম হ্যারি হ্যারি করিতেছে। বহুদূরে আর একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, সেটা রবিনসনের।

বলা বাহুল্য রবিনসনের মুখ হইতে কোনো শব্দই বাহির হইতেছে না, এবং বাহুল্য হইলেও বলা প্রয়োজন যে নূতন নার্স আর কেহই নহে, হোটেলের সেই লী।

দেশী ও বিদেশী

১

একটি বিদেশী গল্প পড়িয়াছিলাম। গল্পটি এইরূপ—

জীবনে নানারূপ দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছেন বলিয়া জনৈক ভদ্রলোকের বড়ই গর্ব্ব ছিল। দশবারোটি মাত্র গল্প ছিল তাঁহার সম্বল। তিনি ইহারই কোনো না কোনো একটার দ্বারা সর্ব্বত্র মজলিস জমাইতেন। সিংহ-শিকার হইতে প্রেম করা, এবং সিংহ-শিকার হইতে প্রেম করার মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি পর্য্যায় ছিল তাঁহার গল্পের বিষয়। এক দিন তাঁহার এক বন্ধুর বাড়িতে কয়েকজন নবাগত ব্যক্তিকে লইয়া আসর জমাইয়া বসিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রোতা-দিগকে তিনি বলিয়া যাইতেছেন—"মনে করুন, একা আমি সেই গভীর জঙ্গলে, হাতে একটা মাত্র বন্দুক! আফ্রিকার জঙ্গল! কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পরেই প্রার্থিতের দেখা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে গুলি! গুলি খেয়ে সিংহটা ঘোর গর্জ্জন করে লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে—"

এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, তাঁহাকে তাঁহার বাড়ি হইতে টেলিফোনে ডাকিতেছে। ভদ্রলোক চট্ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

মিনিট তিনেক পরে ভদ্রলোক ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসামাত্র সকলে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল,—"তার পর কি হল?" "তার পর তাকে চুম্বন করলাম এবং বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরে এলাম!"

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোক কোন্ গল্পটি বলিতেছিলেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

২

দেশী গল্পটি গল্প নহে, একটি মর্ম্মান্তিক সত্য ঘটনা। বাঙালী মেয়েরা এত সেন্টিমেণ্টালও হইতে পারে! থিয়েটার-বায়োস্কোপ তাহাদের না দেখাই ভাল। বিশেষ করিয়া ছাত্রীদের।

এমন ছাত্রীর কথাও জানি, যে পরীক্ষার তিন দিন আগেও সিনেমার কোনো একটি বিশেষ ছবি দেখিয়া সর্ব্বসাকুল্যে বিংশতিতম সংখ্যা-পূরণের গর্ব্বে আত্মহারা হইয়াছে।

মিস্ ব্যানার্জি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রী। এম-এ পরীক্ষায় তাহার লেখা একটি প্রশ্নের উত্তর আমি দেখিয়াছি। দৈবক্রমে দেখিয়াছি। দেখা অন্যায় জানিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার চেয়েও, যিনি দেখাইয়াছেন তাঁহার অন্যায় বেশি। মিস্ ব্যানার্জি নাট্যমন্দিরে "বিজয়া" এবং "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক যে একাধিক-বার দেখিয়াছেন তাহা তাঁহার এই লেখাতেই প্রকাশ পাইবে। প্রফেসরের দেওয়া প্রশ্ন, এবং মিস্ ব্যানার্জির দেওয়া উত্তর দুইটিই

দিলাম। বলা বাহুল্য, দুইটিই ইংরেজি হইতে অনুবাদ এবং ইহাতে যদি কোনো ভুল থাকে সেজন্য আমি দায়ী নহি।

প্রশ্ন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের স্থান কোথায়?

উত্তর। "ভারতবর্ষ" এই একটি মাত্র নামের দ্বারা এত বড় দেশকে এক কল্পনা করিয়াছিলেন কবি ও রাষ্ট্রনীতিকগণ। এই কল্পনা আংশিকভাবে প্রথম বাস্তবে পরিণত করেন চন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার রাজত্বকালে আমরা শাসনের যে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি দেখিতে পাই তাহার পরিপূর্ণতা হঠাৎ একটিমাত্র সম্রাটের হাতেই কিরূপে সাধিত হইল ইহা অনুসন্ধিৎসুর নিকট বিস্ময়কর হইলেও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সঠিক বিবরণ, তথ্য, বা ইতিহাস না পাওয়াতে ধরিয়া লইতে হইবে যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তই নিজের অসাধারণ ক্ষমতা এবং প্রতিভাবলে একটি সম্পূর্ণ অভিনব শাসনপদ্ধতি এবং পূর্ণাঙ্গ বিধি-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত (ব্রাত্য রাজাদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে) আমরা আর্য্য রাজাদিগকেই দেখি এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্য কোনো বড় অনার্য্য রাজাকে দেখি না। সুতরাং যতদূর জানিতে পারা যায় চন্দ্রগুপ্তই ভারতবর্ষের সত্যকার প্রথম অনার্য্য সম্রাট। কিন্তু এতৎসম্পর্কে একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজা যিনিই হউন, রাজ্যপরিচালনা-কার্য্যে মন্ত্রণাদান চিরকাল ব্রাহ্মণেই করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত এই চাণক্যের হাতে-গড়া রাজা। গ্রীকদের হাত হইতে দেশের সম্মান এবং স্বাধীনতা রক্ষা কার্য্যে প্রতিভাবান যুবক চন্দ্রগুপ্তকে ব্রাহ্মণ চাণক্য কিরূপ সফলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

"অর্থশাস্ত্রের" বিষয়বস্তু দেখিয়া যদিও ইহা প্রমাণ হয় না যে

একমাত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বেই সমাজনীতি এবং রাজনীতির চরম উন্নতি হইয়াছিল, কারণ চন্দ্রগুপ্তের সময়ের পূর্ব্ব হইতে ইহার অস্তিত্ব না থাকিলে "বৃন্তহীন পুষ্পসম" হঠাৎ ইহার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না, তথাপি একথাও স্বীকার্য্য যে অর্থশাস্ত্র চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে রচিত এইরূপ ঐতিহ্য থাকায় ইহা বেশ বুঝা যায় যে রাজনীতি ইত্যাদি পূর্ব্ব হইতেই থাকিলে, হয় ঐ শাস্ত্রগুলি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে উন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কারণ বড় রাজত্বের জন্যই ব্যাপকতর রাজনীতিরও প্রয়োজন অনুভূত হয়, অথবা যদি ইহা পরবর্ত্তী কালে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় ইহাই প্রমাণ হয় যে চন্দ্রগুপ্ত-বড় রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মোটের উপর ভালই লাগিল। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী চাণক্যের ভূমিকায় যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাঁহার সহকর্ম্মীগণ সেরূপ পারেন নাই। বিশেষত চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় যিনি নামিয়াছিলেন, তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তকে অত্যন্ত খাটো করিয়া ফেলিয়াছেন। চাণক্যেরই আর একটি রূপ দেখিলাম আমরা রাসবিহারীর চরিত্রে। কঙ্কাবতী, বিজয়ার ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার হাবভাব, চালচলন, কথাবলার ভঙ্গি, সমস্তই অত্যন্ত সুমার্জ্জিত। বিজয়ায় ইহাকেই দেখিব বলিয়া পুনরায় গিয়াছিলাম, কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। নরেনের ভূমিকাতেও অন্য লোক —বিশ্বনাথ ভাদুড়ী নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। দিদি, তুমি আসিলে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু কে কোন ভূমিকায় নামিবেন পূর্ব্বে ঠিক-ঠিক না জানিয়া কিছুতেই যাইব না। মনের মত না হইলে, সিনেমায় যাইব। আশা করি খোকা-খুকীরা ভাল আছে।

দাম্পত্য-প্রেম

মহা আড়ম্বরে হিরণকুমারের সহিত শ্রীমতী অলকার বিবাহ হইয়া গেল। হিরণ বি-এ, অলকাও বি-এ, একেবারে রাজযোটক। একই কলেজে ইহারা পড়িত। অথচ কি সংযম। কেহ কাহারো প্রেমে পড়ে নাই; কেহ কাহারো জন্য কবিতা লেখে নাই, কেহ কাহারো জন্য ল্যাবরেটরি হইতে পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করে নাই, কেহ কাহারো জন্য একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলে নাই। দুই জনে নিতান্তই দৈবযোগে এক ক্লাসে পড়িত, একই লেকচার শুনিত এবং একই নোট খাতায় টুকিত। কেহ কাহারো দিকে ভাল করিয়া তাকায় নাই, একটি কথা কেহ কাহাকেও বলে নাই; অত্যন্ত লঘু ভাবে হাঁস যেমন গায়ে জল না মাখিয়া সাঁতার কাটে, তেমনি নিরাপদে এবং নিরাসক্তভাবে পরস্পর পরস্পরকে লেশমাত্র বাধ্যবাধকতার মধ্যে না টানিয়া দুই বৎসরের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিল।

তারপর যখন উভয়েই যথাসময়ে বি-এ'র সীমারেখা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখনো কেহ কাহারো জন্য ভাবে নাই—এমন কি বাসে বা ট্রামেও দৈবক্রমে কেহ কাহাকে দেখে নাই।

বিবাহটাও নিতান্ত নিয়তি। যে দৈবযোগ এতকাল উভয়কে উভয়ের আকর্ষণ হইতে দূরে রাখিয়াছিল, সেই একই দৈবের আনুকূল্যে এখন মেয়ের বংশ ছেলের বংশমর্য্যাদার পক্ষে হানিকর হইল না, ছেলের পিতার সহিত মেয়ের পিতার পরিচয় হইল এবং দেখা গেল, মেয়ের পিতার কিছু ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও আছে।

কিন্তু এই সব দৈবযোগাযোগ হিরণকুমার বা অলকা দেবীকে কিছু

মাত্র স্পর্শ করিল না। কথাবার্তা, আদানপ্রদান, দেখাশোনা সম্পর্কিত যাবতীয় ঝঞ্ঝা ও ঝঞ্ঝাট দুই পিতা দুই দিক হইতে দুই পর্ব্বতের মত মাথা দিয়া ঠেকাইলেন। কন্যার পিতার মস্তকচূড়ায় শুভ্র তুষার জমিয়া গেল। ছেলে ও মেয়ের হৃদয়বাষ্প মেঘ হইয়া দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল।

হিরণকুমার উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিল। সে অবিলম্বে মেরিষ্টোপস্ হইতে আরম্ভ করিয়া শেলী-কীটস রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বই কিনিয়া ফেলিল। এত প্রেমের উৎস কোথায়? হিরণকুমার তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। এ প্রেম, না স্বর্গ? বৈঠকখানা না বটানিক্যাল গার্ডেন? বুঝিয়া উঠা গেল না। হৃদয়তাপ যখন একশত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উঠে, তখন মন নানারূপে ব্যাকুল হয়। কেহ খুন করে, কেহ ভগবানকে খুঁজিতে বাহির হয়, কেহ বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে।

কিন্তু অলকা দেবীর অবস্থা কেহই বুঝিল না। সে যেমন ছিল, তেমনিই রহিল। বাসর ঘরে বসিয়া সে একবার পরীক্ষার পড়া নষ্ট হইতেছে এইরূপ ভুল করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীকে হঠাৎ একবার হিষ্টরির প্রফেসর মনে করিয়া স্যর বলিয়া ডাকিয়াছিল। সে শিবপূজা করে নাই, স্বামী লাভের জন্য কবচ ধারণ করে নাই, মনে মনে কোনোরূপ প্রার্থনাও করে নাই। প্রার্থনা করিয়াছিল বি-এ ডিগ্রীর জন্য, ফলে স্বামী লাভ ঘটিল। এখন হয়ত শিব পূজা করিবে।

অলকাকে তাহার কলেজ-হষ্টেল-সুলভ অভ্যাসের কোনোটাই ছাড়িতে হয় নাই। কারণ সেখানে সে যে সেণ্ট মাখিত, যে পাউডারের প্রলেপ মুখে লাগাইত, গুণে ও মূল্যে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে বাজারে এমন সেণ্ট বা পাউডার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। হষ্টেলে যে স্বাধীনতার হাওয়া বহিত, বিবাহ তাহার চেয়ে অধিক স্বাধীনতা দিতে

পারে নাই। হষ্টেল, গৃহকর্ম্ম বন্ধন হইতে যে মুক্তি দিয়াছিল, সে মুক্তি স্বামীগৃহে নাই; হষ্টেল সময়ের যে অবাধ বিস্তার দিয়াছিল, এখানে তাহার অভাবটাই প্রবল,—কিন্তু তবু অলকা তাহার স্বামীকে ভালবাসিল। যে-কোনো স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হইলেই তাহাকে সে এমনি ভালবাসিত—ইহা তাহার কৃতিত্বও নয়, গৌরবও নয়।

কিন্তু হিরণকুমারের মনে অন্য দিক হইতে স্রোত বহিতেছে; সে মনে করিল, অলকা তাহার জন্যই বিধাতার কারখানায় প্রস্তুত স্ত্রী। স্বামী নামক আইডীয়া যেমন যে-কোনো পুরুষের মূর্ত্তি ধরিতে পারে, স্ত্রী সেরূপ নহে। স্ত্রী একটি বস্তু, উহা হইতে পরে আইডীয়া জন্মাইতে থাকে। আইডীয়া মরিয়া গেলে সন্তান জন্মে। কাজেই হিরণকুমার পাঁচসিকা খরচ করিয়া একটি উৎকৃষ্ট সেফটি ক্ষুর কিনিয়া আনিয়া দুইবেলা গাল চাঁচিতে লাগিল।

একদিন, যেমন প্রায়ই হয়, অলকা তাহার পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। অলকার পূর্ব্ব স্বাধীনতা হইতে এইটুকু আজিও কেহ কাড়িয়া লয় নাই। হিরণ বা তাহার বাড়ীর কেহ ইহাতে আপত্তি করে না; একদল পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের মেয়ে যদি বাড়ী চড়াও করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব অধিকারের জোরে ঘর হইতে বন্ধুকে বাহির করিয়া লইয়া যায়, তবে এ সংসারে এমন পাষাণ কেহ নাই যে না গলিয়া থাকিতে পারে। ইহা নারীহরণ নহে, কিড্‌ন্যাপিং নহে, ডাকাতি নহে, ইহা শুধুই পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের একদল মেয়ের ভূতপূর্ব্ব অধিকার। হিরণের পিতার দিক হইতে কোনো আপত্তিই উঠে না। হিরণ নিজে একটু উসুখুসু করে,—বাড়িটা খালি খালি বোধ হয়, কিছুক্ষণ পরে সেও বাহির হইয়া যায়।

সেদিন হিরণ বিরহজনিত ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতেছিল, হঠাৎ

আবিষ্কার করিল, অলকা ও তাহার বান্ধবীগণ একাগ্রমনে গল্প করিতে করিতে সেই পথ দিয়াই যাইতেছে; হিরণকে কেহ লক্ষ্যই করে নাই। হিরণ নিতান্তই কৌতুকপরবশ হইয়া স্ত্রীর গা-ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় চকিতে অলকার হাতে একটি চিমটি কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, পথে গ্যাসের আলো দুই একটি কেবল জ্বলিয়াছে। ব্যাপারটি দুষ্টলোকের ঔদ্ধত্য ভাবিয়া সকলেই চুপ করিয়া গেল। ইহার প্রতিকার তাহাদের বুদ্ধির অগম্য।

হিরণ ইহার চেয়ে মনোহর রসিকতা স্ত্রীর সঙ্গে করিবার সুযোগ পায় নাই। সুযোগটি অপ্রত্যাশিতরূপে আসিয়াছে এবং পরে ইহা লইয়া আরো যে কত শত রসিকতার সৃষ্টি হইবে, তাহা ভাবিয়া সে পুলকিত হইয়া উঠিল। সহজ রসিকতা হিরণের কোনোদিনই আসে না—অলকাকে হাসাইতে গিয়া তাহাকে সে কতবার কাঁদাইয়াছে। খুব উচ্চাঙ্গের হাস্যরস সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে সে নিজে গলদঘর্ম্ম হইয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর আজ দয়া করিয়া তাহার হাতে রসিকতার অফুরন্ত একটি উৎস তুলিয়া ধরিলেন। হিরণ আজ বাঁচিয়া গেল।

হিরণ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া কি ভাবে কথাটা পাড়িবে এবং কি কি প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করিয়া একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের আঘাতে অলকাকে স্তম্ভিত করিয়া দিবে এবং পরে এই কথা লইয়া তাহাকে প্রতিদিন লজ্জা দিবে, হাসাইবে, বিদ্রূপ করিবে, তাহার প্ল্যান করিতে লাগিল। সে ঠিক করিল—কিন্তু বিশেষ একটা কিছু ঠিক করিল না, অনেকগুলি ব্যাপার এক সঙ্গে ঠিক করিল।

অলকা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু হিরণ খাওয়া দাওয়ার পূর্ব্বে কোনো কথা বলিল না। পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলিলে সব মাটি হইবে।

নিজের রসিকতায় সে সর্ব্বদা নিজেই এত হাসিয়া বসে যে, অন্তে হাসিবার অবসরই পায় না ; কাজেই হাসিও চাপিয়া রাখিতে হইবে। হিরণ ইহা জানিত, সেই জন্য সে যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া রহিল। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া অলকা ঘরে আসিলে হিরণ একখানা চাদর গলায় ফেলিয়া পথে যেমন করিয়া তাহার গা-ঘেঁসিয়া দ্রুত চলিয়া গিয়াছিল তেমনি করিয়া যাইবার অভিনয় করিল। অলকা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হিরণ এবারে আবার বিপরীত দিক হইতে দ্রুত আসিয়া অলকার হাতে চিমটি কাটিয়া গেল—অলকা আঃ করিয়া উঠিল ; কিন্তু ব্যাপার বুঝিতে পারিল না। হিরণ নিজের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—মনে করিল অলকা ইচ্ছা করিয়া তাহার উন্মুখ আনন্দের চোখে ধূলা নিক্ষেপ করিতেছে।

গম্ভীর ভাবে হিরণ প্রশ্ন করিল, আজ যে বেড়াতে গিয়েছিলে, এর মধ্যেকার সব চেয়ে মনে রাখবার মত ঘটনাটি কি বল ত?

অলকা হাসিয়া বলিল, পানওয়ালার কাছ থেকে সুপ্রভার পান কেনা।

আর কি ?

কই, আর ত কিছু মনে পড়ে না।

শুনিয়া হিরণ আরো গম্ভীর হইয়া গেল। ঠাট্টার সূত্র যে পর্য্যন্ত নিরাপদে টানা যায়, হিরণের মতে অলকা সূত্রটি ততদূরই টানিয়াছে, ইহার পরেই ছিঁড়িয়া যাইবে।

কিন্তু হিরণ নিজেকে সম্বরণ করিল। সে প্রাণপণে নিজের প্ল্যানের বিফলতাজনিত দুঃখটাকে চাপিয়া বলিল—

অলকা—

কি ?

কেউ যদি পরস্ত্রীকে স্পর্শ করে, তা হলে সেই স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি ?

স্পর্শটা উদ্দেশ্যমূলক কিনা জানা চাই।

সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক।

তা হলে সেই লোকটাকে যদি কেউ চাবুক মারতে চায়, তাহলে আপত্তি করব না।

দেখি তোমার হাত—বলিয়া হিরণ অলকার হাতখানি টানিয়া লইয়া যেখানে সে চিমটি কাটিয়াছিল, সেইখানটা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখা গেল, সেখানে কোনো চিহ্নই নাই। কিন্তু চিহ্ন দেখিবার জন্যই সে হাত দেখিতেছে না, চিমটিকাটা ব্যাপারটা যাহাতে অলকার মনে পড়ে ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু অলকা কোনো কথাই বলিল না।

হঠাৎ হিরণের মনটা বিষম দমিয়া গেল। সন্দেহের একটা দমকা হাওয়া যেন তাহার মনের আলোটি দপ করিয়া নিবাইয়া দিল। তাহার বোধ হইল অলকা মিথ্যা কথা বলিতেছে। একটি লোক নিঃসন্দেহরূপে তাহার হাতে চিমটি কাটিয়া গেল, অথচ অলকা নিশ্চিত জানে সে তাহার স্বামী নহে, অপরিচিত কোনো লোক। নিশ্চয়ই অলকা এইরূপ অজ্ঞাত স্পর্শ উপভোগ করে এবং ইহাই বোধ হয় প্রথম নহে।

বাহিরে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, গুরু গুরু ডাক শোনা যাইতেছে, বৃষ্টিও নামিয়া পড়িল। মিলনের এই উপযুক্ত অবসরে হিরণের মনে বিরহ জাগিল। অলকা বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, সে স্বামীকে ভুলাইয়া পথে বাহির হয় পরপুরুষের স্পর্শসুখ উপভোগ করিবার জন্য। তাহার মন যদি পবিত্রই হইবে তাহা হইলে সে সব খুলিয়া বলিল না কেন? বলিল না কেন যে, পথে কে একটা গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক তাহাকে স্পর্শ করিয়া অপমান করিয়া গিয়াছে?

হিরণের মনে গভীর ব্যথা জাগিয়া উঠিল। সম্মুখে স্ত্রী, তাহাকে দেখা যায়, স্পর্শ করা যায়, তাহার চুলের গন্ধ পাওয়া যায়, তাহার বর্ণের আভা নয়ন মন পুলকিত করে। এত কাছে, কিন্তু কোথায় অলকা? কোথায় অলকাপুরী?

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর—শতাব্দীর বিরহ-ভার হিরণের বুকে চাপিয়া বসিল। তাহার মন শূন্য, হৃদয় শূন্য, তাহার কর্ণ বধির, চক্ষু অন্ধ। কোথায় প্রিয়তমা—কোথায় প্রেয়সী, হায়,

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়—

প্রেয়সী, তুমি এস এস!

হিরণ অলকার উপর কি প্রতিশোধ লইবে চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু চিন্তা করিতে গেলেই বুকের ভিতর হু-হু করিয়া ওঠে; মনে হয়—

Rough wind that moanest loud
Grief too sad for song…

মনে হয়, কি একটা বিপর্যয় হইয়া গেল। মনে হইল অলকার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে—ঐ বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ, চারিধার কাঁদিতেছে—কাঁদ কাঁদ—

Deep caves and dreary main,
Wail, for the world's wrong!

পৃথিবীর কোথায় কি সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে—অলকার একার কি দোষ! কিন্তু অলকাকে আজ শাস্তি দিতেই হইবে। এমন শাস্তি

দিতে হইবে, যাহাতে তাহার উপযুক্ত শিক্ষা হয়। স্বামীকে প্রতারণা! অসতী! ছুরি দিয়া তাহার একটা আঙুল কাটিয়া দিলে তবে মনের জ্বালা জুড়ায়। হিরণ পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া মনটাকে একটা বিকট উল্লাসে উল্লসিত করিয়া তুলিল। তাহার মনে পড়িল—

বহুদিন মনে ছিল আশা,
ধরণীর এক কোণে, রহিব আপন মনে
ধন নয় মান নয় শুধু ভালবাসা
করেছিনু আশা!

কিন্তু হায় রে স্ত্রীলোক! তোমাকে আবার পুরুষে পূজা করে! আজ এই ঝড় বৃষ্টির রাত্রে অলকাকে খুন করিতে হইবে। খুন করার কথা মনে হইতেই হিরণ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা ছাড়া আর পথ কই? খুন, খুন, অলকার জীবন গ্রহণ—হিরণের মনে আবার একটি গান জাগিয়া উঠিল—

সে বুঝি লুকিয়ে আসে
বিচ্ছেদের এই রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য জাগার
আসন পাতে,
ধেয়ানের বর্ণ ছটায় ব্যথার রঙে
মনকে সে রয় রাঙ্গিতে
যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়—
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।

হিরণের মনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে ছুরি লইয়া নতমুখী অলকার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে কাহাকে দেখিতেছে?

কোথায় অলকা? এ যে পিশাচী! কুৎসিতা, কুরূপা, পাপের প্রতিমূর্ত্তি! হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল—

Cat! Who hast pass'd thy grand climateric,
How many mice and rats hast in thy days,
Destroy'd?

কিন্তু ইহাতে মন সান্ত্বনা মানিল না। বাহিরে দুর্জ্জয় প্রলয়—হিরণের মনেও তাহারই প্রতিধ্বনি। সে ছুরি সংযত করিল। সমগ্র স্ত্রীজাতির উপর তাহার মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। জীবন বিষাক্ত মনে হইল। এই ঘৃণিতাকে লইয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে! এই পিশাচীকে শয্যাসঙ্গিনী করিয়া পুরুষের মূল্যবান জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইবে? কি করিয়া রাত্রি কাটাইব?

ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভ প্রার্থনং মে।
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ॥

না, আর জিজ্ঞাসা নয়, খোসামুদি নয়, একটা কিছু করিতেই হইবে; কিন্তু স্ত্রীহত্যা! কি প্রয়োজন স্ত্রীহত্যা করিয়া? বরঞ্চ আত্মহত্যা করাই ভাল। স্ত্রীহত্যা করিলে আজীবন অনুশোচনা করিতে হইবে—ইহার চেয়ে আত্মহত্যা সহজ। কাহাকেও কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। কাহারো জন্য কখনো কোনো অনুতাপ করিতে হইবে না। হিরণ স্থির করিল আত্মহত্যাই করিবে। চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। অলকা চেয়ারের উপর বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দড়ি বাঁধিবার জন্য আবার ঐ চেয়ারখানারই প্রয়োজন! হিরণ ইত্যবসরে গুন্ গুন্ করিয়া একটি গান গাহিয়া লইল।

অস্তাচলের ধারে আসি,

পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই।

গানের শব্দে অলকার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। বাহিরের বৃষ্টিও থামিয়া গিয়াছে। হিরণ দড়ি লইয়া গাহিতেছে—

ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই,

তারি তরে বাজাই বাঁশি।

হিরণ চেয়ারের একধারে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাখার হুকের সঙ্গে দড়ি বাঁধিয়া, নিজের গলার সঙ্গে তাহার প্রান্তভাগ বাঁধিবার জন্য একটি প্যাঁচ লাগাইয়া গাহিয়া উঠিল—

আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে···

অলকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া হিরণকে ধরিয়া ফেলিল, এবং রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কর কি ?

হিরণ বলিল, কাল পথে তোমার হাতে চিমটি কেটেছিল কে ?

কখন ?

সন্ধ্যা ছটায়।

বল কি ! সন্ধ্যা ছটায় ত আমরা সুপ্রভাদের বাড়ীতে তার গান শুনছিলাম।

তবে চিমটি কাটা হল কাকে ? বড় গোলমালে পড়লাম দেখছি। যাক, গলা থেকে দড়িটা টেনে নাও ত।

সংক্ষিপ্ত-সার

সাধ এবং সাধ্য এই দুইটি বস্তুর সমন্বয় ঘটিলে মানুষ সাধারণত যাহা যাহা করিয়া থাকে, সাময়িক-পত্র বাহির করা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। আমি একদা একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। এটা আমি নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলাম যে ইহার ভিতর সাধ ও সাধ্যের অংশ যতটুকুই থাক, সাধনার অংশ না থাকিলেও চলে।

কাগজখানি জনপ্রিয় করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তাহাতে একটা প্রশ্নোত্তর বিভাগ খুলিয়াছিলাম। এই অধ্যায়ের মুখবন্ধে লিখিয়া দিয়াছিলাম—শুধু বহির্জ্জগতের সংবাদ নহে, কোনো বিষয়ে বিপদে পড়িলেও যথাসাধ্য সদুপদেশ দেওয়া হয়। ষোল পৃষ্ঠার কাগজের আট পৃষ্ঠাই এই অধ্যায়টি অধিকার করিত—এবং বিক্রির দিক দিয়া ইহাতে সুফল ফলিয়াছিল।

প্রশ্নোত্তর বিভাগে এক দিন একখানি চিঠি ছাপি। একটি মেয়ে জানিতে চায় তাহার কি করা উচিত। তাহার মাতা তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যে পাত্রটিকে ঠিক করিয়াছেন, তাহাকে সে চেনে; তাহার সম্বন্ধে যেটুকু জানে তাহাতে সে বুঝিতে পারিয়াছে, এ বিবাহে সে সুখী হইতে পারিবে না। এখন তাহার কি করা উচিত। মায়ের কথা রাখা উচিত কি নিজের বুদ্ধিতে চলা উচিত।

কাগজে তাহার উত্তরে লিখিলাম, নিজের বুদ্ধিই উত্তম, কিন্তু

মায়ের মনে কষ্ট দিয়া নিজের বুদ্ধিতে চলা খারাপ। সব চেয়ে ভাল বিবাহ না করা।

ইহার পর তাহার নিকট হইতে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি পাই। লিখিয়াছে, আমার বুদ্ধিই যে অভ্রান্ত তাহা কেমন করিয়া বুঝিব ?

উত্তরে লিখিলাম, বিবাহ দৈব ঘটনা—মানুষের উহাতে কোন হাত নাই। সুতরাং তাহার সঙ্গে আপনার বিবাহ যদি দেবতার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কেহ তাহা রোধ করিতে পারিবে না—সুতরাং নিজের বুদ্ধিতে চলায় আপত্তি কি ?

সে লিখিল, মায়ের ইচ্ছায় চলি বা নিজের ইচ্ছায় চলি, বিবাহ দৈবনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা যখন রোধ করা যাইবে না, তখন মায়ের ইচ্ছায় চলিলে আপত্তি কি ?

আমি প্রশ্নটার একটি দিক মাত্র দেখিয়াছিলাম, অন্য দিকটা শ্রীমতী পরিতৃপ্তি দেখিল। আসলে সে উভয় দিকই দেখিল। বুঝিলাম মেয়েটি বুদ্ধিমতী।

তাহার সঙ্গে যে সব চিঠির আদানপ্রদান হইয়াছিল তাহার কতকগুলির সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

আমার চিঠি—আপনি একটি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তবিক ব্যাপারটা দুই দিক হইতেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন দিকটা ঠিক তাহা কিছু দিন ভাবিয়া আপনাকে জানাইব।

তাহার চিঠি—ইহা সমস্যা নহে। দেখিতে হইবে এই যে আমাদের মধ্যে ভালবাসা হইতে পারে কিনা।

আমার চিঠি—সেটা পূর্ব্বেই কেহ গণনা করিয়া বলিতে পারে না। এমন ত দেখা যায় যাহারা পরস্পর পরিচিত নয় তাহাদের বিবাহ হয় এবং সে বিবাহ বেশ সুখের হয়।

দুই সপ্তাহ চিঠি আদানপ্রদানের পর আমাদের দেখা হয় এবং মুখে তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিই। সে আমার কথা সমস্তই মানিয়া লয়। পুরুষের বুদ্ধির কাছে উহারা চিরদিনই হার মানিয়া আসিয়াছে। ইহার পর একবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পরিতৃপ্তির বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। সে খুব সুখেই আছে। অল্প কয়েকদিন হইল আমাদের মধ্যে যে চিঠি চলিয়াছে তাহার সারাংশ এই—

তাহার চিঠি—খোকা ভাল আছে, মা তোমাকে একবার দেখিতে চায়, অবিলম্বে চলিয়া আসিবে। আমার চিঠি—কালই যাইতেছি।

* * *

আর সবই ঠিক আছে কেবল কাগজ চালাইয়া যে টাকাটা নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলাম, কাগজ বন্ধ করিয়া দিয়া সে টাকায় এখন সংসার চালাইতেছি।

এক রাত্রি

মেঘের উপর মেঘ জমিয়া রাত্রির গাঢ় অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। বিরাট প্রান্তর, উত্তর দিক হইতে প্রবল ঝড় উঠিয়া আসিল। বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সহস্র শাখা প্রশাখা লইয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। বিপুল মেঘ-গর্জ্জন, গুরু গম্ভীর গর্জ্জন; বিদ্যুতের আলোতে যতদূর দেখা যায়, জনমানবের চিহ্ন নাই। প্রবল বেগে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। ঝড়ে বৃষ্টিতে বজ্রধ্বনিতে প্রলয়ের লীলা চলিতেছে। অন্ধকার যেন কঠিন হইয়া পৃথিবীর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে—চারিদিকে কিছু নাই, কেবল অন্ধকার, বজ্রে বিদ্যুতে আহত অন্ধকার, ঝড়ে বৃষ্টিতে আর্ত্ত অন্ধকার।

একটি যুবক ইহারই মধ্যে সেই বিরাট প্রান্তরের মাঝখানে একা, —প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায় সে যাইবে, তাহার লক্ষ্যস্থল কোথায় কেহ বলিতে পারে না। পথহীন প্রান্তরে তাহার শঙ্কিত গতি দেখিলে তাহার নিজেরই কোনো লক্ষ্য আছে কি না সন্দেহ হয়। বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ধারা তীরের মত তাহার মুখে চোখে আসিয়া বিঁধিতেছে। তাহার এক হাতে প্রকাণ্ড একখানা খাতা, তাহারই লেখা কতকগুলি গল্প, কবিতা এবং একটি নভেলের পাণ্ডুলিপি—অন্য হাতে এক জোড়া স্যাণ্ডেল।

পথের চিহ্ন নাই, পথে সে চলিতেছে না। যে-কোনো দিকে যে-কোনো একটি আশ্রয় না পাইলে এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের হাত হইতে তাহার বাঁচা অসম্ভব। ঝড়ের প্রবল বেগ তাহাকে অনির্দ্দিষ্ট

দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। কতক্ষণ চলিল সে খেয়াল তাহার নাই। ঝড় ক্রমশ বাড়িয়াই যাইতেছে। ঝড়ের বিরুদ্ধে দুইখানি পায়ের ক্ষীণ প্রতিবাদ চলে না—সে হতাশ হইয়া ঝড়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

ঐ যে অন্ধকার এবং বৃষ্টির শব্দ ভেদ করিয়া "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে" গানটি শুনা যাইতেছে, উহা ঐ যুবকই গাহিতেছে। অত্যন্ত ভয়ে সে গান ধরিয়া দিয়াছে, ইহা ছাড়া আর কোনো উপায় তাহার ছিল না। এক হাতে খাতা অন্য হাতে জুতা লইয়া যুবক দৌড়াইতেছে আর গাহিতেছে—"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।"

ছুটিতে ছুটিতে যখন তাহার ছুটিবার সামর্থ্য নষ্ট হইয়া গেল, পা আর চলে না, তখন হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে সে দেখিতে পাইল সম্মুখে একখানি কুটীর। ঈশ্বর কি তাহাকে দয়া করিলেন? যুবক, ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া নিঃসঙ্কোচে কুটীরের বারান্দায় গিয়া উঠিল। বিদ্যুতের আলোতে দেখা গেল কুটীরের দরজা বন্ধ। তাহার আর দরজা ঠেলিবার প্রবৃত্তি হইল না। মনে হইল, পাছে তাহাকে চোর কিংবা ডাকাত মনে করিয়া কুটীরস্বামী তাহার সহিত অসদ্ব্যবহার করে। সে যে-আশ্রয়টুকু দৈব-কৃপায় লাভ করিয়াছে, অতিরিক্ত লোভ করিয়া তাহাকে সে নষ্ট করিবে না। সে বারান্দার উপরেই বসিয়া পড়িল। ছুটিবার সময় সে যে গানটি ধরিয়াছিল, অতিরিক্ত ভয়ে তাহার সুর তাল সমস্তই গোলমাল হইয়া গিয়াছিল—তাই কুটীরে পৌঁছিয়া গানটি আর একবার উত্তম করিয়া গাহিবার ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল, কিন্তু ঐ একই কারণে এ প্রবৃত্তিটিও সে সংযত করিল।

যুবক শক্তিশালী, কিন্তু সে বর্ব্বর নহে। বর্ব্বর হইলে সে এতক্ষণ

কুটীরের দরজায় ধাক্কা দিয়া কুটীরবাসীকে জাগাইয়া আশ্রয় দাবী করিত। ফলে হয়ত উভয় পক্ষে বিশ্রী একটা কেলেঙ্কারী হইত। কিন্তু সেরূপ করিবার ইচ্ছা তাহার হইল না। সে বারান্দায় বসিয়াই ঝড়-বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিতে লাগিল।

সমস্ত দৈব দুর্য্যোগ এখন একটিমাত্র পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। এখনি ঐ বদ্ধদ্বার কুটীর হইতে একটি তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া হঠাৎ যুবককে দেখিয়া চমকিয়া উঠিবে, এবং তাহাতে যুবক ততোধিক চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবে, ভয় পাইও না দেবী, আমি ঝঞ্ঝাতাড়িত আশ্রয়হীন পথিক, এখানে একটু আশ্রয়ের আশায় আসিয়া পড়িয়াছি, অন্ধকাব দূর হইলেই চলিয়া যাইব।

তরুণী বলিবে—তোমার পরিচয় চাই।

যুবক—ক্ষণিকের অতিথি আমি, আমার বিশেষ কোনো পরিচয় নাই, তবু যতটা সম্ভব দিতেছি।

আমি একাধারে কবি, গল্পকার, উপন্যাস-লেখক, ব্যায়াম-সমিতির সভ্য এবং ইনশিওর‍্যান্সের এজেণ্ট। আমি বিবাহ করিতে চাই, কিন্তু পারি না। আমি কবিতা লিখিতে জানি একথা শুনিয়া এক পাল মেয়ে আমার পিছু লইয়াছে—জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার আর কোনো মোহ নাই, বিশেষ করিয়া যাহারা গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে চায় তাহাদের সম্বন্ধে। বিশ্বাস কর না? ঠিক এই রকমেরই এক দল মেয়ে আমার পিছু লইয়াছে, তাহাদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য আমি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছি—পথে এই ঝড়। কিন্তু হে দেবী, আমাকে রাখিতে চেষ্টা করিও না। অজ্ঞাতকুলশীলকে আশ্রয় দিতে নাই, তুমি ত আমাকে চেন না।

তরুণী—তুমি দেবতা, তোমাকে আমি চিনি, কয়েক বৎসর ধরিয়া চিনি।

এই সময়ে বিদ্যুতের আলোয় উভয়ে উভয়কে দেখিল। কেহ কাহাকেও পূর্ব্বে দেখে নাই। কিন্তু তবু সেই মেঘ বিদ্যুৎ ঝড় ঝঞ্ঝার অপরূপ উন্মত্ততার মধ্যে তাহাদের মনে হইল, সমস্ত পরিচিত স্পষ্ট পৃথিবী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহারাই একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্থির জগতের মধ্যে অবস্থিত একমাত্র নরনারী। তাহাদের কোনো পরিচয় থাকিবার দরকার করে না, দুই জনে যে দৈবাৎ আসিয়া মিলিত হইয়াছে ইহাই তাহাদের এই মিলনের একমাত্র কৈফিয়ৎ। কুটীরখানি যেন পদ্ম-পত্র; সমস্ত পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছে, সমস্ত অতীত নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, দুটি বিন্দু অশ্রুর মত তাহারা যেন সেই পদ্মপত্রের উপর টলমল করিতেছে।

ধূমায়মান অন্ধকার-জগতের মধ্যে যেন দুইটিমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আপন হৃদয়তাপে জ্বলিতেছে। স্রোতের মত বহমান নীহারিকাপুঞ্জ হইতে দুইটি নরনারী যেন এইমাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে—অতীতের ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া অনন্ত ভবিষ্যৎ তাহাদিগকে তাহার রত্নমঞ্জুষার ভিতরে আবৃত করিয়া রাখিল।

এ সব হয়ত কিছুই সত্য নয়, কিন্তু তথাপি যুবকের আশা করিবার, বিশ্বাস করিবার অধিকার আছে। দেহের শক্তি যাহার অটুট, মনের স্বাস্থ্য যাহার নষ্ট হয় নাই, সে চিরকাল বিশ্বাস করিবে, হতাশ হইয়া জড়ের মত গৃহকোণে পড়িয়া থাকিবে না। যুবক ব্যায়াম সমিতির সভ্য—বাইসেপস্ ট্রাইসেপস্ নাচাইয়া লোককে বিস্মিত করে, তাই সে বিশ্বাস করিল, কুটীরের ভিতর হইতে তাহার আহ্বান আসিবে। সে

ভুলিয়া গেল, মাঠের প্রান্তের একটিমাত্র কুটীরে একটিমাত্র রাজকন্যা বা অন্য কাহারো কন্যা কাহারো জন্য রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকে না। এদিকে ঝড় এলোমোলো ভাবে বহিতে সুরু করিয়াছে, আকাশ হইতে মেঘগর্জ্জনের একটি দীর্ঘ ধারা অবিরাম বহিয়া যাইতেছে, যে-কোনো স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিবার এই ত উপযুক্ত সময়।

যুবকের ভাবোন্মাদনা আসিল। এই বাংলার বুকে চৈতন্যদেবের এক দিন এমনি ভাবোন্মাদনা আসিয়াছিল। যুবকের পার্থিব দৃষ্টি লুপ্ত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। তাহার সম্মুখ দিয়া গুরুসদয় দত্ত মহাশয় নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেলেন।

ইঁহার পরে আসিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। গায়ে নামাবলী, হাতে মেঘনাদবধ কাব্য—কণ্ঠে মা মা ধ্বনি। মাইকেল বলিলেন—ছোকরা, হরিনাম কর, উদ্ধার হইবার আর কোনো পথ নাই। এমন সময় দূরে চীৎকার শোনা গেল, "মাইকেল মাইকেল।" পরক্ষণেই বিদ্যাসাগর মহাশয় চৌরঙ্গী হইতে নূতন স্যুট পরিহিত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া বলিলেন, I am totally disgusted with these unbending Hindoos.—I am nonplussed—must have recourse to legislation—no help. বলিয়া ফস্ করিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সুদীর্ঘ ললাটদেশ মার্জ্জনা করিতে করিতে মাইকেলের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

এ যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইতেছে, অভিনেতারা আসিয়া নিজ নিজ পার্ট আবৃত্তি করিয়া যাইতেছে। যুবক বসিয়া বসিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে এ সব উপভোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন বাউল-বেশে রবীন্দ্রনাথ এবং বৃদ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন। বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন, চল হে রবি, হেদুয়াতে চল, এনডিওর‍্যান্স সাঁতার কখনো

দেখি নাই, দেখিতে হইবে। দেখা গেল একটি মেয়ে হাত পা বাঁধা অবস্থায় জলে ভাসিতেছে। সে নাকি গত পঞ্চাশ ঘণ্টা ধরিয়া এই অবস্থায় আছে। রবীন্দ্রনাথ ইহা দেখিবামাত্র গান ধরিয়া দিলেন—"শুধু ভাসা—শুধু ভাসা।" ইহাতে বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া "কেষ্ট কেষ্ট" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় মহা হাল্লা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন। দেখা গেল, তিনি তিন চারি জন লোকের সঙ্গে তুমুল তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন, মেয়ের বয়স আঠারোর উপরে কি নীচে—সাঁতারে তাহাকে প্রলুব্ধ করা হইয়াছে না তাহার নিজের সম্মতি আছে, এ সব বিষয় পরিষ্কার না করিয়া আমি এখান হইতে এক পা নড়িব না। ফলে তুমুল গোলমাল আরম্ভ হইল এবং গোলমালের মধ্যে সমস্ত দৃশ্য এবং লোকজন মধ্যপথে মিলাইয়া গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবকটি হঠাৎ কাহার যেন ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহার সত্যই মনে হইল ঝড় দানবটা সমুদ্রপারের কোনো রাজকন্যাকে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া এই কুটীরের ভিতর বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই হাতে আজ সে মুক্তি পাইবে। তাহার নিশ্চিত আরামের সুখশয্যা হইতে ছিন্ন করিয়া তাহাকে দুঃখের সঙ্গে মুখামুখী দাঁড় করাইয়া দিয়া ঝড়-দৈত্যটা আজ নিষ্ঠুর আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দৈত্যের হাত হইতে আজ তাহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মনে হইতেই রাজকন্যা মুহূর্তমাত্রও আর তাহার কল্পনায় আবদ্ধ হইয়া রহিল না, একেবারে বাস্তবরূপে অন্ধকারের নিকষে কাঁচা সোনার রেখা অঙ্কিত করিয়া চারিদিকে সুরভি ছড়াইয়া যুবকের সম্মুখে

আসিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, আমাকে বাঁচাও, দেখিতেছ না, আমাকে একটা দৈত্যের মত লোক বন্দী করিয়া রাখিয়াছে ?

রাজকন্যার রূপের অপরূপ জ্যোতিতে, তাহার সুগন্ধ নিশ্বাসে তাহার সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরে যুবক একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার দেহমনের শক্তি এখন কোথায় ? তাহার আর উঠিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য রহিল না, সে বসিয়া বসিয়াই রাজকন্যার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিল, তুমি আমার অন্তরে প্রবেশ কর, আমি সেখানে তোমাকে কিছু কাল রক্ষা করিব ; লক্ষ্য করিয়া দেখ, তোমার রূপের মাদকতায় আমি বিহ্বল, তোমাকে বাঁচাইব কি, তুমি আমাকে বাঁচাও। Give and take ছাড়া উপায় নাই।

যুবক হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়া বল সঞ্চয় করিবার জন্য ডন দিতে লাগিল ; কিন্তু হাত পা তাহার আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, দুই চারিটি ডন দিতেই সে মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল, আর উঠিতে পারিল না। অসহায় ভাবে শুইয়া শুইয়াই বলিতে লাগিল—আমার ক্ষণিকের মোহকে ক্ষমা করিও, তুমি আমার কেহ নহ।

রাজকন্যা আহত হইল। তাহার আয়ত দুটি চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু যুবক তাহা দেখিতে পাইল না। রাজকন্যা যুবকের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া সেই পায়ের উপর তাহার রাত্রির মতই ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি লুটাইয়া দিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, তোমার মোহ মিথ্যা হউক, কিন্তু তোমার করুণা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

প্রলয় রাত্রির গভীর অন্ধকার কালো চুলের রূপ ধরিয়া যুবকের পায়ে লুণ্ঠিত হইল। কিন্তু যুবক সেই সর্ব্বগ্রাসী আঁধারের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য পা দিয়া তাহার মস্তক ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাজকন্যা অভিমান-আহত হইয়া চকিতে দূরে সরিয়া গিয়া কহিল, তোমাকে ধিক্‌, তুমি দেবতা নহ, তুমি সনাতনী ভূত।

আকাশ ভাঙিয়া অবিরল ধারায় বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে, দমকা হাওয়া বৃষ্টির ধারাগুলিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চারিদিকে সজোরে বহিয়া বেড়াইতেছে—চোখ ধাঁধাইয়া দিয়া বিদ্যুতের চমক খেলিয়া গেল। সেই আলোতে যুবক হঠাৎ দেখিতে পাইল, তাহার সম্মুখে সেই তরুণী দাঁড়াইয়া—তাহার চেহারা কি সুন্দর! চোখে চশমা, চুলের ধারা দুই দিকের কপাল ঢাকিয়া যমুনার ঢেউয়ের মত কালো ঢেউ তুলিয়া কানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার ললাটে ও কি সিঁদূরের চিহ্ন? বিদ্যুতের আলোকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই যুবক বুঝিতে পারিল, সিঁদূর নহে একটি ক্ষত চিহ্ন—সেখান হইতে রক্তের একটি ক্ষীণ রেখা কিছু দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ললাটে ও কি?

তরুণী বলিল, এ আমার আশীর্ব্বাদ।

যুবক বলিল, ইয়ার্কি রাখ, সত্য করিয়া বল, ও কিসের আঘাত।

তরুণী বলিল, পুরুষের নিকট হইতে নারী ত চিরকাল এই আশীর্ব্বাদই লাভ করিয়াছে, তাহা কি তুমি জান না?

যুবক বুঝিল, তরুণী শরৎ-সাহিত্য পড়িয়াছে এখন আর অন্য উপায় নাই; তথাপি সাহস করিয়া বলিল, কাপুরুষের আঘাতকে আশীর্ব্বাদ বলিও না, তোমাদের আত্মবোধ জাগ্রত হউক, হইলে তোমাকে এক খণ্ড 'মহুয়া' উপহার দিব।

তরুণী কাঁদিয়া বলিল, দেবতা, আমার কিছুরই দরকার নাই, আমি কিছুই বুঝিতে চাহি না। তোমার মধ্যে আমাকে চিহ্নহীন করিয়া

ডুবাইয়া দাও, আমাকে বার বার দূরে ঠেলিয়া দিও না। আমি অনেক পথ ঘুরিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি।

যুবকের মস্তিষ্কের মধ্যে কে উত্তপ্ত ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া লিখিয়া গেল, ঐ ক্ষত চিহ্ন—কাপুরুষ—তুমিই এক দিন পায়ের আঘাতে উহার ললাটে আঁকিয়া দিয়াছ, আজ কি তাহা ভুলিয়া গেলে?

যুবক সহসা দুই হাত বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, দেবী, আমি তোমাকে বিবাহই করিব—আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে—

প্রচণ্ড বজ্রধ্বনির মধ্যে কথা মিলাইয়া গেল, আর বলা হইল না।

* * *

ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। যুবক চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখিল, সূর্য্যোদয়ের আর বেশি বিলম্ব নাই। তাহার কাপড় জামা তখনো সিক্ত। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল; বাড়ি ফিরিতে হইবে—রাত্রির অন্ধকারে কি ঘটিয়াছিল তাহা আর মনেই আসিল না, কিন্তু একটু বুঝিল, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। কোথায়? যেখানে হউক।

দিনের আলোয় দিনের পৃথিবীর জাগরণ, সেখানে রাত্রির স্থান নাই। নীচে নামিয়া যুবকের কুটীরখানি একবার দেখিবার ইচ্ছা হইল। চারিদিকে ঘুরিয়া যুবক দেখিতে পাইল—জনপ্রাণী দূরের কথা, কুটীরের পিছন দিকে বা পাশে কোনো বেড়া নাই, তিন দিক একেবারে খোলা। এটা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলে সে অনায়াসে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিতে পারিত এবং তাহাতে বৃষ্টির ছাটও গায়ে অপেক্ষাকৃত কম লাগিত।

মহাচীনের পথে

ফরমোসা দ্বীপের টাইকহু শহরে সম্প্রতি সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের সেন্সাস্ রিপোর্টে দেখা যায়, টোকো এবং টাকাও শহরে দেড়শত তরুণ, পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে—সাহিত্য-বৃদ্ধির ইহা একটি অকাট্য প্রমাণ।

কিন্তু শহরে যাহা একবার ফ্যাশন হয় মফঃস্বলে তাহার বিস্তার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। টাইকহু শহর হইতে সাহিত্য ক্রমে ফরমোসা দ্বীপের প্রতি গ্রামে আগুনের মত সকলকে পুড়াইয়া চলিয়াছে।

ফরমোসা দ্বীপের চা, চিনি এবং কর্পূর হইতে জাপান গবর্ণমেণ্টের যে আয় হইত তাহা বর্ত্তমানে কিছু কমিয়াছে বটে কিন্তু উক্ত দ্বীপে জাপানের কাগজ-রপ্তানি সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজনৈতিক কোনো বিপর্য্যয় ঘটে নাই, কিন্তু শীঘ্রই ঘটিবে বলিয়া মনে হইতেছে। মফঃস্বলের অধিকাংশ কৃষক চাষ-আবাদ ছাড়িয়া সাময়িক পত্র বাহির করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কৃষকেরা লাঙল চালাইবার সময় যে সকল গান এতকাল গাহিয়া আসিয়াছে তাহা এবং তাহা হইতে একটু পরিমার্জ্জিত অনেক নূতন গান তাহারা সপ্তাহে সপ্তাহে নিজেদের কাগজে ছাপাইতেছে।

এই ভাবে দেশের কৃষি নষ্ট হইলে অদূর ভবিষ্যতে ফরমোসা দ্বীপে একটা বিপ্লব অনিবার্য্যরূপে দেখা দিবে—এরূপ বুঝিতে পারিয়া গভর্ণমেণ্ট টাইকহু শহরে ডেঞ্জার সিগন্যাল চড়াইয়াছেন। মোটকথা

পরিমণ্ডলে এমন একটা শূন্যতা ঘটিয়াছে যাহাতে চতুর্দ্দিক হইতেই সাহিত্যের মাদক হাওয়া ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিতেছে। সাহিত্যের নেশা বড শক্ত নেশা। ফরমোসা দ্বীপের অবস্থার কথা শুনিয়া চীন ত হাসিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, আফিঙের নেশা ছাড়িতে তাহাদের আর কষ্ট হইবে না।

কিন্তু সাহিত্যের প্রভাবে কিছুদিন আগে দেশে একটি বিশিষ্ট কেলেঙ্কারি ঘটিয়াছে। ফরমোসা দ্বীপে রিপাবলিক গভর্ণমেণ্ট হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের নিমিত্ত জাপানদেশ হইতে একটি কমিশন আসিয়াছিল, কমিশন এক মাস ধবিয়া নানারূপ অনুসন্ধান এবং পর্য্যবেক্ষণ্ করিয়া যে রিপোর্টটি লিখিয়াছেন তাহা আগাগোড়াই কবিতায় লেখা। গ্রন্থখানি কমিশন-কাব্য হিসাবে বাজারে বিক্রয় হইতেছে। মিলিটারি বিভাগ হইতে একটি রিপোর্ট সম্প্রতি জাপানে পাঠানো হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেযে রঙ্গব্যঙ্গ অথবা দ্বিপদী চতুষ্পদী কবিতা যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে জাপানরাজ উদ্বিগ্ন হইয়া এক-জাহাজ সৈন্য ফরমোসার শান্তিরক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

নব-সাহিত্যিক সঙ্ঘ বাজার করা ছাড়িয়া সভা করিয়া বেডাইতেছে। ইহা ছাড়া প্রতি সাত দিন অন্তর এক এক জন লেখককে উপলক্ষ করিয়া সভা বসে। সভায়, সেই লেখক কি কি লিখিয়াছেন এবং কতখানি স্বার্থত্যাগ করিলে তাঁহার লেখাকে স্কুমার সাহিত্যের স্বজাতি বলিয়া মানা যায়—ইহা আলোচিত হয়। এরূপ না করিলে কাহার লেখার মূল্য কি তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না— ইহার উপর বই বিক্রিও নির্ভর করে। খুড়া জেঠা মাসী পিসী এবং

দুই চারিজন প্রতিবেশীকে অনুরোধ করিয়া সভা করা হয়। তাঁহারা একে একে সকলেই গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারকে প্রশংসা করেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সকল সভায়, হাততালি দিবার জন্য কতকগুলি শাশ্বত লোক আছে—ফরমোসা দ্বীপের সভাতেও ইহারা নিয়মিত দেখা দিয়া থাকে। খুড়া জেঠার বাহবা এবং ইহাদের হাততালি এই দুইএর সংযোগে লেখকের প্রতিষ্ঠা। সেল্‌ফ ডিফেন্স এবং সেল্‌ফ প্রিজারভেশন—এ দুইএরই ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন। দেশভেদে ইহার বিভিন্নতা হয় না। যাহা হয়, তাহা বাহ্য—লেখকদের আত্মরক্ষার পদ্ধতি আভ্যন্তরিক তাগিদেই আবিষ্কৃত হইয়াছে—অন্যদেশের পদ্ধতির নকল করিয়া হয় নাই।

টাইকহু শহরের এবং ফরমোসা দ্বীপেব অন্যান্য স্থানের এইরূপ একটি অরাজক আবহাওয়া এবং পরিবেষ্টনীতে আমাদের নগুচিকান কিছুদিন হইল খনিত্র ত্যাগ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছে। কিন্তু নগুচিকানের কপালে সুখ ছিল না। তাহার আরম্ভ যেমন হঠাৎ— শেষও তেমনি হঠাৎ হইয়া গেল। কেবল জমিয়া উঠিতেছিল—কিন্তু দৈব ছিল প্রতিকূল।

নগুচিকানের বর্ত্তমান বয়স তেত্রিশের কাছাকাছি—সে গত ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল না—মাটি খোড়াই তাহার ছিল পৈতৃক পেশা। কিন্তু ১৯১৮ সালে ইউরোপে যে সময়ে মহাযুদ্ধের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় সেই সময় চীনদেশের একজন কাঠের মিস্ত্রী ফ্রান্সের সীমান্ত প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ফরমোসা দ্বীপে আসবাবের দোকান খোলে। এই মিস্ত্রী, লোকের চেহারা দেখিয়া চরিত্র বুঝিতে পারিত। নগুচিকানের সঙ্গে দৈবক্রমে এই বৃদ্ধ মিস্ত্রীর দেখা হয়। নগুচিকান তাহার খনিত্রের হাতল তৈয়ারীর জন্য ইহার দোকানে গিয়াছিল। বৃদ্ধ মিস্ত্রী নগুচিকানের দাড়িতে হাত দিয়া

বলিয়াছিল, বাবা, তোমার ত এ কর্ম্ম নয়। তোমার কর্ম্ম, সাহিত্য। বৃদ্ধের কথা শোন।

নগুচিকানও খনিত্র বিক্রয় করিয়া কাগজ কলম কিনিয়া ফেলিল। এক বন্ধু তাহাকে বর্ণপরিচয়ে সাহায্য করিল। বর্ণপরিচয় শেষ হইলেই নগুচিকান বুঝিতে পারিল তাহার বিদ্যা শেষ হইয়াছে, এখন কণ্টিনেণ্টাল টুর দেওয়া দরকার। নগুচিকান পিতার নিকট হইতে জোর-জবরদস্তি করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিল। যাওয়া প্রায় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় এক টেলিগ্রাম।

কিসের টেলিগ্রাম? কে পাঠাইল?—নগুচিকানের মাথা ঘুরিয়া গেল। নর্থ পোল হইতে কে তাহাকে স্মরণ করিতে পারে? টেলিগ্রামে লেখা আছে—"নগুচিকান, তোমার পেশা পরিবর্ত্তনের সংবাদ আমার কাছে পৌছিয়াছে—আমি টাইকহুতে রওনা হইতেছি। বালাক্লাভা।" বালাক্লাভা নামের কাহাকেও নগুচিকান চেনে না। টেলিগ্রামের রহস্য নগুচিকান ভেদ করিতে পারিল না। তাহার ভ্রমণ স্থগিত রহিল।—রওনা হইবার জন্য সে যে-সকল মালপত্র গুছাইয়াছিল তাহা লইয়া সে টাইকহু শহর হইতে কিছু দূরে এক নির্জ্জন পল্লীতে গিয়া উঠিল। নগুচিকান ঠিক করিল সে লোক ঠকাইবে—টাইকহু শহরের মূর্খ পাঠকদের ঠকাইতে বেশি পরিশ্রমের দরকার নাই, অল্পেই কার্য্য উদ্ধার হইবে। দেশে প্রচার হইল, নগুচিকান একটা হোমরাচোমরা হইবার জন্য সমুদ্রপারে গিয়াছে। এদিকে নগুচিকান তাহার লটবহর লইয়া গ্রামে বেশ যুৎ করিয়া সংসার পাতিয়া বসিল। নগুচিকান দুধের ছেলে—বাপমায়ের আদরে মানুষ—সখ করিয়া খনিত্র ধারণ করিয়াছিল—আবার সখ করিয়াই সে আজ

তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। অবশ্য 'বর্ণপরিচয়'এর পর হইতে সাহিত্যের রস সে কিছু পাইয়াছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

নগুচিকান এখানে বেশ সুখে আছে—ফার্ণ, পাইন, তাহার চারিধারে একটা মাদকতা সৃষ্টি করিয়াছে। এক মহাজনের নিকট হইতে সে একটি ঘোড়া ভাড়া করিয়া লইয়াছে; উহাতে চাপিয়া সে দূরে একটা ছোট শহরে আমোদ প্রমোদ করিতে যায়। শহরটির নাম ফুকিকাকু, সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। নগুচিকান যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ফুকিকাকুর দিকে যাইতে থাকে তখন তাহার সাহিত্যিক চোখ পথচারিণীদের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়, মন তাহার চঞ্চল হইয়া ওঠে, সে কোথায় আছে ভুলিয়া যায়, ঘোড়া হইতে পড়িতে পড়িতে কোনো রকমে নিজেকে সামলাইয়া লয়। রাত্রিতে নগুচিকান গৃহে ফিরিয়া আসে, তারপর রঙীন চোখে সে তাহার বিদেশ ভ্রমণের কাহিনী পাতার পর পাতা লিখিয়া চলে।

নগুচিকানকে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া ফুকিকাকুর এক সিগারেটওয়ালি (এখানে পানওয়ালি নাই) তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলে। নগুচিকান প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাহাড়ের পথে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া ইহারই ঘরে অতিথি হয়।—নগুচিকান বলে, চিংসা তুই আমাকে কিনে ফেলেছিস। চিংসা বলে, বিশ্বাস হয় না—এমনি কথা আজ পর্য্যন্ত পঁচিশ জন লোক আমাকে বলেছে, তোকে দিয়ে ছাব্বিশ জন পূর্ণ হ'ল। নগুচিকান একথা শুনিয়া অভিমান করে—চিংসার বিছানায় টান হইয়া শুইয়া পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া থাকে, চোখের জলে বালিশটি ভিজিয়া যায়। চিংসা তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বালিশটি সরাইয়া দিয়া নগুচিকানের মাথাটি কোলে লইয়া বসে। কোলের উপর একখণ্ড অয়েল ক্লথ পাতিয়া দেয় আর

বলে, ভড়ং দেখে আর বাঁচিনে—নে নে মাথাটা ঠিক কর, বলিয়া জাপানী বিয়ারের বোতলটা মুখের কাছে ধরে। নগুচিকান চোঁ চোঁ করিয়া অনেকখানি বিয়ার গিলিয়া ফেলে।—তারপর হঠাৎ উঠিয়া বোতলটা চিংসার মুখে ধরে।

নগুচিকান তাহার ভ্রমণকাহিনীতে একজন ভ্রমণসঙ্গিনীর কথা উল্লেখ করে। সেই ভ্রমণসঙ্গিনীর নাম চিংসা। পুরাতন একখানি "চীন ভ্রমণ" খুলিয়া কিছু অদল বদল করিয়া এবং প্রতি ঘটনার সঙ্গে চিংসাকে জড়াইয়া নগুচিকান ভ্রমণকাহিনীর খিচুড়ি বানাইতে থাকে। সে লেখে, চীন ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার সুবিধা হইয়া উঠিল না, সুতরাং চীনদেশ লইয়াই আমার ভ্রমণকাহিনী আরম্ভ এবং শেষ হইল। তারপর একদিন সে চিংসাকে ফেলিয়া গোপনে টাইকহুতে পলাইয়া আসিল।

টাইকহু শহরের খবরের কাগজে তাহার চীনভ্রমণের সংবাদ ছাপা হইল, এবং একখানি মাসিকপত্র তাহার ভ্রমণকাহিনী কিনিয়া লইয়া ধারাবাহিক ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল। রচনাটির নাম হইল মহাচীনের পথে।

মহাচীনের পথের শেষ কিস্তি প্রকাশ হইবার সময় হইতেই নগুচিকানের আত্মীয়স্বজনপ্রীতি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। কোনো পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইলেই তাহাকে যে-কোনো চায়ের দোকানে লইয়া চা-কেক জোর করিয়া খাওয়াইয়া দেয়। যাহাদের চা সহ্য হয় না তাহাদের ডাক্তারি দোকানে লইয়া কাহাকেও খানিকটা অ্যাসিড কাহাকেও খানিকটা অ্যালক্যালি—কাহাকেও বা অ্যাসিড-অ্যালক্যালির মিকশ্চার খাওয়াইয়া তবে ছাড়ে।

মহাচীনের পথে পুস্তকাকারে বাহির হইতেছে, নগুচিকান প্রুফ দেখায় ব্যস্ত আছে, এমন সময় আবার একখানা টেলিগ্রাম আসিয়া

হাজির। নগুচিকানের হাত কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখে, সাইবেরিয়া হইতে আসিতেছে—প্রেরক সেই বালাক্লাভা। নগুচিকানের জীবনে বালাক্লাভার আবির্ভাব অবশ্য ফরমোসা দ্বীপে আজও রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। এ রহস্য ভেদ করিতে পারে এমন লোক সেখানে আর কে আছে?

বালাক্লাভা লিখিতেছেন, আমি সাইবেরিয়া পর্যন্ত আসিয়াছি; সব সংবাদই রাখিতেছি; বই বাহির হইবার মুহূর্তে ফরমোসায় পৌঁছিব।

নগুচিকানের চিন্তাশক্তি লোপ পাইল। বালাক্লাভার কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল—কিন্তু দ্বিতীয় বার টেলিগ্রাম আসাতে আবার তাঁহার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। বালাক্লাভা কে? দেখা দূরে থাক নগুচিকান জীবনে কখনো তাহার নামও শুনে নাই। অথচ মজা এই, তিনি আসিতেছেন। এই আসা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

মহাচীনের পথে বাজারে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বন্ধুগণ চা কেক এবং অ্যাসিড-অ্যালক্যালির প্রতিদান স্বরূপ ঠিক করিয়াছে বেশ একটা বড় রকম সভা করিয়া মহাচীনের পথের গ্রন্থকারকে অভিনন্দন দান করিবে। ইতিমধ্যে নগুচিকান ফরাসী রুষ এবং চীনা কন্‌সালের নিকট যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কয়েকখানা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়াছে। ইঁহারা কেহই উক্ত ভ্রমণকাহিনী পড়েন নাই—কিন্তু তথাপি ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাদের ভালই লাগিয়াছে। বিদেশী রাজদূতেরা ভদ্রলোক। ভূতপূর্ব্ব খনিত্রধারীর লেখা বই বলিয়া দেশের লোকেও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কয়েকখানা

কিনিয়াছে এবং তোবা তোবা করিতেছে। সম্প্রতি চীনের বৃদ্ধ কবি চাচুং চাং মহাচীনের পথের নাম শুনিয়াই লেখককে উৎসাহিত করিয়া একখানা চিঠি দিয়াছেন।

নগুচিকানের জন্য অভিনন্দন সভা বসিয়াছে। সভাপতি হইয়াছেন আশী বৎসরের বৃদ্ধ ফুচুসাকু। ইনি যৌবনে মাউণ্ট মরিসনে আড়াই বৎসর সাহিত্য-সাধনা করিয়া ফরমোসা দ্বীপের উপর একখানা সুদীর্ঘ কবিতার বই লিখিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ক সভা হইলে এই ফুচুসাকু ছাড়া অন্য কাহাকেও সভাপতি করা হয় না, কেননা শ্রদ্ধা করিবার মত সাহিত্যিক এখানে আর কেহই নাই।

নগুচিকানের কিন্তু বাহাদুরি আছে। সে তাহার মহাচীনের পথে বই সম্বন্ধে চীনের টিং টুং আশ্রমের নান চাং-এর নিকট হইতে একখানি চিঠি জোগাড় করিয়াছে, সভায় সেই চিঠি খানিই তরুণ সাহিত্যিক ঘুটুং কর্ত্তৃক পঠিত হইতেছে :—প্রিয় নগুচিকান, তোমার মহাচীনের পথে পড়লাম। তোমার বই পড়ে আমার মনে হয় কি জান? মনে হয় cela ne veut rien dire—অর্থাৎ এইটিই জীবনের শেষ কথা। তোমার বইখানি আগাগোড়া পড়লে কেবলি মনে হয়—Il es juste que vous soyez puni—অর্থাৎ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। তোমার মহাচীনের পথে তোমার ঘোড়া থেকে বড়। কিন্তু Si voue ne prenez pas garde a´ ce cheval, il vous donnera un coup de pied,—prenez garde prenez garde—অর্থাৎ ঘোড়াই তোমাকে সার্থকতার পথে পৌঁছে দেবে। ভয় নেই, ভয় নেই। ইতি আশীর্ব্বাদ নান চাং।

চিঠি পড়া হইলে হাততালি পড়িল—সভার মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

সভাপতির আর কিছু বলা হইল না। একটি লোক আসিয়া খবর দিয়া গেল বালাক্লাভা সভাগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি ভিতরে আসিতে চান। নগুচিকাম এ সংবাদে দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু এক পাও চলিতে পারিল না। একটা আশঙ্কায় তাহার মনটা ভারি হইয়া উঠিল। একটি কথা পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না ; ইহা দেখিয়া সভাপতি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, বালক্লাভাকে ডাক। সঙ্গে সঙ্গে বালাক্লাভা ঝড়ের মত ভিতরে ঢুকিয়াই সমস্ত লোক ঠেলিয়া নগুচিকানের কাছে চলিয়া গেলেন। বিরাট দেহ, ভীষণ বলিষ্ঠ হাত পা—সকলে তাঁহাকে দেখিয়া থ হইয়া গেল। বালাক্লাভা কোনো কথা বলিলেন না, কেবল এক টিপ নস্য টানিয়া নগুচিকানের গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া গুন গুন করিয়া গান করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। সভায় তুমুল কোলাহল এবং হৈ হৈ গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কি হইল কেন হইল—ব্যাপার কি—কেহ কিছু বুঝিল না, কেবল নগুচিকান চড় খাইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

নগুচিকানের জীবনের এই প্রথম অভিনন্দন যে এরূপ ভাবে শেষ হইবে তাহা কেহই কল্পনা করে নাই। টাইকহু শহরে সাহিত্যিকদের ভিতরে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহারা বালাক্লাভার নামে কাঁপিতেছে। কে এই গুণ্ডা অথবা দেবতা অথবা নর-দেবতা অথবা নর-পশু অথবা নর-রাক্ষস যে শুধু চড় মারিতেই আসিয়াছিল এবং চড় মারিয়াই চলিয়া গেল, তাহা লইয়া বিস্তর গবেষণা হইতেছে কিন্তু কোনো কিনারা হইতেছে না।

পনের দিন পর টেলিগ্রাম আসিল—আমি নিরাপদে নর্থপোলে ফিরিয়া আসিয়াছি, তোমরা আমার জন্য কোনো চিন্তা করিও না।

—বালাক্লাভা

চিত্রা

বয়সের তাপ এমন একটা মাত্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে হৃদয়টা টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, এবং বুদ্ধি বাষ্পে পরিণত হইয়াছে। সেদিন একটা পদদলিত পিঁপড়ের যন্ত্রণা দেখিয়া মনে হইতেছিল, রাজেন মুখুজ্জের যাবতীয় টাকা কাড়িয়া লইয়া পিঁপড়ের অসহয়তা ঘুচাইবার কাজে লাগি।

পৃথিবীতে বেকার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার সমস্ত দায়িত্ব সেদিন আমারই উপর চাপিয়াছিল। বাংলা দেশের তরুণ আমি—নিশ্চিন্ত থাকি কি উপায়ে? যথেষ্ট টাকা চাই— কিন্তু ইচ্ছা যদি প্রবল হয় তাহা হইলে টাকার অভাব ঘুচাইতে তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। ইচ্ছাটা হওয়া চাই আগুনের মত—সেটা মন হইতে মনান্তরে ধরাইয়া দেওয়া দরকার। স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, প্রথমতঃ এক কলিকাতা শহরে যদি কাজ আরম্ভ করি এবং ধনীদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে পারি তাহা হইলে দীন ভারতবর্ষের মুখে আবার হাসি ফুটিবে। ইচ্ছাটা করিয়াছিলাম তিন বৎসর আগে কিন্তু ভারতবর্ষ আজও কাঁদিতেছে। বলা বাহুল্য আমি কৃতকার্য্য হই নাই। না হইবার কারণ, বাড়ি বাড়ি ঘুরিবার জন্য ট্রামের একখানা মাসিক টিকিট করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দশটি টাকা আমার জুটিল না। সাত আনা আট আনা প্রতিদিন খরচ করায় অসুবিধা অবশ্য ছিল না, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম ইহাতে খরচ অত্যন্ত বেশি পড়িয়া যায়।

এক এক বার মনে হয় আমারি ভুল। বায়োস্কোপে ঢুকিয়া ছবির ভিতর দিয়া দেখি পৃথিবীতে ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি—যে দিন ঢুকিতে

পারি, সেদিন টিকিট-ঘরের সামনে মারামারি এবং কাড়াকাড়ির মধ্যে দেখি বিপুল ঐশ্বর্য্য। সে ঐশ্বর্য্য যেমন প্রাণের তেমনি পকেটের। বুঝিতে পারি জগতে দুর্দ্দশা নাই।

মনের এবং ঘরের অবস্থা যখন দুই বিপরীত আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া পিঠে পিঠ লাগাইয়া বসিয়া আছে—তখন হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ডিগবাজি খাইলাম। টেলিগ্রাম আসিল লটারিতে আমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠিয়াছে। টিকিটটা গোপনে কিনিয়াছিলাম, কিন্তু আর গোপন রহিল না। আমার পাওনা দেখিয়া আমাদের পাড়া হইতে এখন অনেক টাকা ছুটিতেছে লটারি মায়া-মৃগের পশ্চাতে।

তিন দিক হইতে তিনটি সদুপদেশ আমি পাইলাম। আমি কুল-গুরু মানি না কিন্তু শুনিলাম আমার পিতামহ মানিতেন। তাহার গুরুদেবের নাতি, বয়সে আমার সমান হইবেন, কখনো পরিচয় নাই—একগাল দাড়ি লইয়া আমার গৃহে আসিয়া বলিলেন, বাবাজি, পদ্মপত্রে জল।

একজন বন্ধু লিখিয়াছেন, টাকাটা হাতে রেখো না ভাই, বীমা কম্পানিতে কিছু চালিয়ে দাও।

আর একজন লিখিয়াছেন, যদি মাথা এবং টাকা উভয়ই ঠিক রাখতে চাও তবে পত্রপাঠ ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত ক'রে ফেল।

গুরুদেবের উপদেশে টাকার প্রতি মায়া কাটাইতে পারিলাম না। অন্য দুইটি উপদেশের মাঝামাঝি রফা করিয়া টাকাটার চারি আনা দিলাম বীমায় আর বারো আনা রাখিলাম ব্যাঙ্কে।

লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন এতদিন দেখিয়াছি, কাজেই পঞ্চাশ হাজারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা আমার পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু বয়সটা ছিল বিধর্ম্মী—ফলে হৃদয়টা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া রহিল। কিন্তু সে ঐ পর্য্যন্তই।

যে উত্তাপ হৃদয়কে গলাইতে পারে—পঞ্চাশ হাজার টাকাকে গলাইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। সুতরাং হৃদয় বিগলিত হইলেও টাকা গলিল না। কল্পনাকে যেখানে খুশী চালনা করা যায়, হাত পাও নিরুদ্দেশের পথে চলিতে বাধা পায় না; কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার মত এতখানি সুস্পষ্ট জিনিসকে কি অস্পষ্ট ছায়ার পিছনে সহজে ঠেলিয়া দেওয়া যায়? পঞ্চাশ হাজারের প্রভু হওয়ার যে একটা গৌরব আছে সেটাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা চলে না।

বন্ধুরা গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল, লোকটা বড় সেয়ানা। যথেষ্ট বাজে খরচ করা সত্ত্বেও এরূপ উপাধি কেন পাইলাম বুঝিতে পারি না। তাহাদের বায়স্কোপে যাইবার খরচ ত আমিই বরাবর দিতেছি—তবে সেটা সুদ হইতে দিতেছি বটে।

সমালোচনা করিবার মত আত্মীয় আমার কেহ ছিল না—বন্ধুরাই এ ভার লইয়াছিল। কিছু দিনের মধ্যে আমার পোষাকের বর্ব্বরতা তাহাদের কাছে এমনি বিসদৃশ ঠেকিল যে তাহাদের লজ্জা নিবারণের জন্য আমার সজ্জা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। এক দিন জামার দোকানে বেশ কিছু খরচ করিয়া বসিলাম। অন্য সময় হইলে ইহাতে আমার ছয় মাসের খাওয়া খরচ চলিত। জনৈক বন্ধু বলিলেন, এইবার ঠিক রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছে। আমি বলিলাম, পরের পুত্রের মত দেখাবার জন্যেই কি এতটা খরচ করলাম? বন্ধু লজ্জিত হইয়া জবাব দিলেন, না ঠিক তা নয়—তবু—, ইহার চেয়ে বেশি তিনি আর বলিতে পারিলেন না। অন্যের হইলে আমি নিজেও উহার চেয়ে বেশি কিছু বলিতে পারিতাম না। "তবু" কথাটা যে একটা অনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত করিল, তাহার রীতিমত একটা মোহ আছে।

সেদিন নব-পোষাকে সজ্জিত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইতেই দেখি,

শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড়-পরা এক বৃদ্ধা আমার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল, বাবা, একটা পয়সা। তাহার চোখ দুইটি কাতর মিনতিতে ভরা, দারিদ্র্যের স্বরূপ তাহার আকৃতিতে সুস্পষ্ট।

আমি নব-সজ্জার আত্মপ্রসাদে মগ্ন, তাহারই বেগে আমি পথে বাহির হইয়াছি—ভিক্ষার দাবী মিটাইবার অবস্থাটা হঠাৎ আমার মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। "একটা পয়সা বাবা" ইহার উত্তরে আমার হাত চকিতে পকেটে যাইতেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না, আমার পা তাহার চেয়ে বেশি বেগে চলিতেছিল। একটু পরেই পিছনে চাহিয়া দেখি, অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি, বৃদ্ধাকে আর দেখা যায় না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। একটা বীভৎসতার হাত হইতে বাঁচিয়া যাওয়া কম সুখের নহে।

পঞ্চাশ হাজারের চাপে মনটা ঠিক ছাড়া পাইতেছে না—বড় দুঃখ বোধ হইতে লাগিল। হাঁটিয়া যাওয়া আর চলিল না; একটা সিগারেট ধরাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই সৌন্দর্য্যময় নর-সমাজে এ কি কুৎসিত দৃশ্য! উল্লাসময় জনবহুল পথের ফাঁকে ফাঁকে বাঁকে বাঁকে কেন এই বীভৎসতার ছড়াছড়ি! ইহাতে চোখ পীড়িত হয়, মন দমিয়া যায়—হঠাৎ মনে আসে ঐ পঞ্চাশ হাজারের কথা।—মনে হয় এই সব ভিক্ষুকের ক্ষুধার গহ্বরে আমার ঐ সম্পদের সৌধটি ভাঙিয়া পড়ে বুঝি!

কিন্তু এ ত সামান্য ঘটনা। যে ঘটনাটি অসামান্য তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে তাহাই ভাবিতেছি।

দৈবদুর্ব্বিপাকে বন্ধুহীন হইয়া একা গিয়াছিলাম সিনেমায়। বইটা ছিল আগাগোড়া একটা হাসির হর্‌রা। টিন-টাইপ ক্যামেরা ঘাড়ে লইয়া এক হতভাগ্য নায়কের করুণ কাহিনী। সংসারে যত হতভাগ্য

আছে তাহাদের কাজই হইল হাস্যরসের যোগান দেওয়া। নায়কের দুঃখ যেখানে সব চেয়ে তীক্ষ্ণ, আমাদের হাসির বেগ সেখানে সব চেয়ে দুর্দ্দাম।

অন্ধকারের উৎস হইতে উৎসারিত বস্তু মাত্রেই আলো কিনা জানি না—কিন্তু আলো মাত্রেই অন্ধকার হইতে উৎসারিত হয়। ছবি দেখিতে দেখিতে আমি যে আলোটি লাভ করিলাম তাহার খোলসটা ছিল শব্দ দ্বারা তৈয়ারী। নিঃশব্দতা বিদীর্ণ করিয়া একটি কথা আমার কানে প্রবেশ করিল: "এ যে জোর ক'রে হাসানো।" আমার কান হইতে শব্দটির উৎপত্তি-স্থল যে মাত্র পনের ইঞ্চি মাত্র তফাৎ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। আমার প্রাণে সাড়া জাগিল—কিন্তু সাড়া জাগাইবার ক্ষমতা আমার কই? পুরুষ নারী-কণ্ঠে অস্থির হইতে পারে, কিন্তু পুরুষের কণ্ঠ-স্বরে মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়ে না সেটা আমি বুঝিতাম। সুতরাং কণ্ঠ-স্বরকে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিলাম। কথাটি শুনিবামাত্র, যাঁহার কথা তাঁহাকে শুনাইয়া বলিয়া উঠিলাম 'ওয়াণ্ডারফুল!'

তাহার পর হাস্য-হিল্লোলের ভিতর দিয়া ছবি দেখা শেষ হইল। আলো জ্বলিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনের আসন হইতে দুইটি চোখও আমার চোখের দিকে জ্বলিয়া উঠিল। আমার সম্মুখের দুইটি আসন দখল করিয়া দুইটি তরুণী বসিয়াছিল—জ্বলন্ত চোখ দুইটি তাহাদেরই একজনের।

তাহার দৃষ্টিতে যে ভাষা ছিল তাহা আমার বোধশক্তির কাছে ব্যর্থ হইল না—আমি সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে। আপনা হইতেই বলিলাম, শপথ ক'রে বলছি, আমি বিদ্রূপ করিনি।

আমরা ভিড়ের সঙ্গে পাশাপাশি চলিতেছিলাম, বাংলা ভাষা বোঝে নিকটে এমন কাহাকেও লক্ষ্য করিলাম না।

*　　•　　*

ইহার পর পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে—আজ ষষ্ঠ দিন, আজও আমি চিত্রার নিকট বাষ্টার কীটনের অভিনয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতেছি। বাংলা দেশের পক্ষে নিশ্চিতই এই গল্পটায় মাত্রাধিক্য হইল, কিন্তু উপায় কি? মিথ্যাই মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্য ব্যস্ত হয়, সত্যের সে সব ভয় নাই।

চিত্রা যে জায়গাটা বুঝিতে ভুল করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল জোর করিয়া হাসানো—বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখা গেল সেই জায়গাটাই সমগ্র নাটকটির মধ্যেকার একটি শ্রেষ্ঠ হাস্য-রসাত্মক অংশ। আমি শেষ পর্য্যন্ত বলিলাম, এই কমেডিটির মধ্যে যে কত বড় একটা ট্র্যাজেডি প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বুঝিতে হইলে নায়কের সঙ্গে অন্তরের সহানুভূতি থাকা চাই।

চিত্রা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার সহানুভতি হয়?

চিত্রার এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র আমাব মনে হইল সহানুভূতি এবং অনুকম্পা যে আমার হয় এইটাই আমার জীবনের চরম কথা। সহানুভূতি হয় বৈ কি। বাহিবে যতই হাসি ঠাট্টা করি, ঐ দুঃখী নায়কের সঙ্গে আমার যেন কোথায় একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। জীবনে কত কামনা-পরিতৃপ্তির পিছনে ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়াছি; মনে হইয়াছে এই সংসারে একমাত্র আমিই হতভাগ্য, কিন্তু আজ ঐ বাষ্টার কীটন্‌কে আমার দলে পাইয়া একটা তৃপ্তি বোধ হইল।

সহানুভূতিতে ডুবিয়া গেলাম। আমার বিশ্বাস হইল আমি সত্যই হতভাগ্য, ক্রন্দন করাই আমার ব্যবসা—ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া

উঠিলাম। এমন সময় চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। বাঁচিলাম। দুঃখ নাই অথচ যদি থাকিত, এই চিন্তাটা যে কি আরামপ্রদ সেটা বুঝিতে পারিলাম। এখন প্রত্যেকটি দুঃখী লোকের সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয়। "রিক্ত যারা সর্ব্বহারা সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা" ইহার চেয়েও ভাল কবিতা লিখিবার প্রেরণা জাগে।

আমি যে সহানুভূতি দেখাইতে পারি এ গৌরব ত ঐ পঞ্চাশ হাজারের কৃপায় পাইয়াছি। এখন আমার মুখের সহানুভূতিতে লোকে ধন্য হয়, কিন্তু যখন আমি ট্রামের টিকিট কিনিতে পারি নাই তখন আমার এ অধিকার ছিল না।

কিন্তু আজ ছয় দিন ধরিয়া চিত্রার নিকট যে অধিকার বিস্তার করিতেছি তাহার শেষ দেখিতে পাইতেছি না। নাটকের চরিত্র সমালোচনা যতই আগ্রহের সঙ্গে করিতেছি ততই উহা হইতে নানারূপ ডালপালা গজাইয়া ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠিতেছে। চরিত্র-বিশ্লেষণ-শিক্ষায় চিত্রার যে পরিমাণ আকুলতা দেখা যাইতেছে আমার শিক্ষা দিবার আগ্রহ তাহার চেয়ে দশগুণ বেশি হইয়া পড়িয়াছে—দেখিতেছি ইহার শেষ হইবে না। বক্তৃতা দিয়া সন্ধ্যা আটটায় পথে বাহির হইতেই একটি ভিখারীর হাত আবার 'একটা পয়সা বাবা' বলিয়া আমার সম্মুখে প্রসারিত হইল, আমি চমকিয়া উঠিলাম।

নাঃ, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ একই কান্না, ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও! আমার পঞ্চাশ হাজারের গোড়া ধরিয়া বিশ্বসুদ্ধ লোক টানিতেছে। শুধু আমার কেন, যাহার যেখানে সঞ্চয় তাহারই চারিধারে হতভাগ্যেরা গর্ত্ত খুঁড়িতেছে, নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।

আরও তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য আজও সম্মুখে চিত্রা বসিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িয়া বড়

বাড়িটার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সেই আধ-আঁধারের আবেষ্টনে আমি যেন আজ নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। রোগীর দেহে তাপ-জনন-কেন্দ্র যখন শক্তিহীন হইয়া পড়ে তখন বরফের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও তাহার দৈহিক উত্তাপ স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, কিছুতেই কমানো যায় না। চিত্রাকে শিক্ষা দিবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর হইতে আমার ভিতরকার সহানুভূতি-শাসন-কেন্দ্রটিও শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে—থার্মোমিটারে ১১০ ডিগ্রী তাপ উঠিয়াছে, কিছুতেই নামিতেছে না। চিত্রার ঘরের দিকে চাহিলাম। দেখা গেল তাহার দেয়াল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহার পুরাতন চেয়ার টেবিল আলমারী একটা হীনতম দারিদ্র্যের ছাপ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার প্রিয় বিড়ালটি অভাবে পড়িয়া ইঁদুর ধরিয়া খাইতেছে। তাহার বোনটি একটা করুণ ভাব মুখে ফুটাইয়া প্রাণহীন পুতুলের মত চেয়ারে বসিয়া রহিয়াছে। চিত্রা কলেজে পড়ে, তাহার বোনও এই বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছে—কিন্তু বয়সের তুলনায় চেহারা বেশি পাকিয়া গিয়াছে। মায়ের রান্না করায় সাহায্য করাতেই তাহার অর্দ্ধেক সময় কাটিয়া যায়। ভাইটি স্কুলে পড়ে—কিন্তু মনে হয় যেন তাহার বয়স পঁচিশ হইয়াছে।

আমি এই সব দেখিতে দেখিতে আবার আমার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া গেলাম। সেই পূর্ব্বাবস্থা, যখন আমার টাকা ছিল না অথচ পৃথিবীর দৈন্য ঘুচাইবার দুঃসাহসিক উৎসাহ ছিল। চিত্রার দুঃখ আর বিশ্বজগতের দুঃখ এক হইয়া দেখা দিল। মনের মধ্যে ঝড় বহিয়া যাইতে লাগিল—আমার বর্ত্তমান সে ঝড়ে উড়িয়া গেল। আমি নির্ব্বাক হইয়া কতক্ষণ ছিলাম মনে পড়ে না, যখন স্বপ্ন ভাঙিল তখন আমার হৃৎস্পন্দনের ধক্ ধক্ শব্দ আমি স্পষ্ট কানে শুনিতে পাইতেছি।

দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলাম। চাহিয়া দেখি আমার ব্যাঙ্ক চিত্রার পাশে দাঁড়াইয়া খুশীতে হাসিতেছে। যন্ত্রচালিতবৎ পকেট হইতে চেক্-বইখানা লইয়া একটা মোটা-রকম অঙ্কপাত করিয়া সই করিলাম। তারপর সেখানা চিত্রার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, আপনাকে এটা নিতে হবে।

চিত্রা বিস্মিত হইয়া বলিল, এর অর্থ ?

আমি বলিলাম, আমাকে ভাই বন্ধু যা হয় ভাবুন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন, এটা আমাদের পরিচয়ের স্মরণ-চিহ্ন।

চিত্রা আর কথা বলিতে পারিল না।

আমার কর্ত্তব্য আমি ঠিক করিয়া ফেলিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, এটাকে একটা শস্তা দাতা-গ্রহীতার ব্যাপার করিয়া ভক্তি আর কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে জীবনে আর এ বাড়িতে আসিব না। ও বুঝুক দানে শুধু মহত্ত্ব আছে তাহা নহে, পৌরুষও আছে।

আমি সৈনিকের কায়দায় উঠিয়া পড়িলাম। চিত্রা হঠাৎ বলিল, ফিরিয়ে নিন্ আপনার চেক, আমার কোনো অভাব নেই—সে-ভাবে আমি কোনো কথা আজ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিনি।

চাহিয়া দেখি তাহার চোখে জল।

আমার মন তখন উত্তেজনার চরমে উঠিয়াছে ; বলিলাম, আমাকে আঘাত দেবেন না, আপনার অভাব নেই বলেই আমাকে আজ অনেক দিয়েছেন, আমার এটা দান নয়, শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

—বলিয়াই দ্রুত বাহির হইয়া পড়িলাম ; দেখিতে দেখিতে আমার পঞ্চাশ হাজার স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল, সে পঞ্চাশ হাজার হইতে পঞ্চাশ লক্ষ, পঞ্চাশ লক্ষ হইতে পঞ্চাশ কোটির পথে যাত্রা করিল।

ভিতরকার পঁচিশ হাজারের বিয়োগে আমার উচ্ছ্বসিত আনন্দ হৃদয় ছাপাইয়া পড়িতে লাগিল। একটা যথার্থ ট্র্যাজেডির মূলোৎপাটন করিবার আনন্দ আজ আমি পাইলাম।

পথে পর পর তিনটি লোকের ধাক্কা খাইলাম। একটা মোটরের হাত হইতে দৈবাৎ রক্ষা পাওয়া গেল। ভাবিলাম, পদাতিকের লাঞ্ছনা আর ভোগ করিব না, ট্রামে উঠি।

ষ্টপের কাছে একটু দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল একটা জীর্ণশীর্ণ স্থবির বৃদ্ধ ডাষ্টবিনের আবর্জ্জনার ভিতর হইতে একটা একটা করিয়া ভাত খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহার অত্যন্ত নোংরা কাপড়ের একটা ধার বিছাইয়া তাহাতে জমা করিতেছে। দেখিয়া ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল।

এই দৃশ্যের ভিতর দিয়া আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম আমার গৌরবের ভিত্তি যে গর্ত্তটাকে এতদিন ভয় করিয়াছে, সেটা একটা প্রকাণ্ড গহ্বরে পরিণত হইয়াছে, তাহার অন্ধকার মুখের ক্রমবর্দ্ধমান বিস্তৃতিকে রোধ করে এমন সাধ্য আর কাহারো নাই।

আমি তখনি উহাকে কিছু দান করিয়া এই হীনতম কাজ হইতে নিবৃত্তি করিতে পারিতাম। চারি আনার পয়সায় ইহা হইতে পারিত, আমার পক্ষে সেটা কষ্টকরও ছিল না—কিন্তু আমি তাহা করি নাই।

উহাকে একটা-পয়সাও দেওয়া মানে উহার কাছে হার স্বীকার করা। যে ভিখারীর হাতকে এক দিন ভয় করিয়াছিলাম, তাহার চলিবার ক্ষমতা ছিল, তাহার সংসারের কাছে হাত বাড়াইয়া ধরিবার সামর্থ্য ছিল, কিন্তু এই আবর্জ্জনা-পঙ্ক হইতে যে ভাত বাছাই করিতেছে, তাহার কোনো ক্ষমতাই নাই, সে কুষ্ঠগ্রস্ত বৃদ্ধ, মাটির উপর বসিয়া বসিয়া কোনো রকমে নিজেকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া চলে, জীবন্ত জগতের

কাছে সে কিছু আশা করিয়া হাত বাড়াইয়া ধরে না—সেখানে তাহার কিছু চাহিবার নাই। তাই সে এই সুখের জগতের উপর প্রতিশোধ লইতেছে। সে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যের শত্রু, সকল শোভাকে সে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে, উহাকে পয়সা দিয়া উহার শক্তিকে আরো বাড়াইয়া দেওয়া একটা কৃতিত্ব নয়।

মনটা ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল, ট্রামের পর ট্রাম চলিয়া গেল, উঠিবার প্রবৃত্তি রহিল না। বিকাল বেলায় যে মদির স্রোতটি আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, সে যেন এই কদর্য্য পাঁকের মধ্যে আসিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল। এত বড় বিস্ময়কর আনন্দের আবর্ত্ত যা আমার রক্তের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতেছিল, তাহার সমস্ত নৃত্য-হিল্লোল স্তব্ধ হইয়া গেল এই একটি মনুষ্য-কীটের দৃশ্যে। উহার ঐ গলিত কুষ্ঠের ক্লেদ দিয়া যেন আমার ব্যাঙ্কের বইখানা সিক্ত করিয়া দিল। আমার পক্ষে সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব হইল না। ট্যাক্‌সি ডাকিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

তাহার পর কোথায় গেল সেই ভিখারী, কোথায় গেল সেই কুষ্ঠ-গ্রস্ত জীর্ণ নরপশু! মনটা ছুটিয়া গেল চিত্রার কাছে—তাহার চোখের জল আমি দেখিয়াছি।

দেখিলাম, বাসনা থাকিলে পৃথিবীতে দুঃখমোচনের সুখ পূর্ণ রূপেই পাওয়া যায়, কেবল দুঃখের জাতিভেদ মান্য করিয়া চলিতে হয়।

একটা আনন্দের বেদনায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। ইহার পর আবার বন্ধুবান্ধব, আবার হাস্য-কৌতুক, আবার খেলা-ধূলা—বাস্।

তারপর একটি রাত্রির গভীর ঘুম।

সকালে উঠিয়াই মনে পড়িল আমার পঁচিশ হাজার টাকা নাই। মনের একটা ঘুমন্ত অংশ ছিল বোধ করি, সে জাগিয়া উঠিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—মূর্খ, করেছিস্ কি?

আমি প্রাণপণ শক্তিতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম, সংসারে অঙ্কের হিসাবটাই ত সব সময়ে বড় নয়। অঙ্কের ক্ষতি অন্য দিক দিয়া যে লাভের ইঙ্গিত করে সেটা কি কিছু না?

একটি মহীয়সী নারীর অন্তরে নিজেকে দেবতা-রূপে প্রতিষ্ঠিত করায় যে গৌরব লাভ হয়, পঁচিশ হাজার টাকা কি তার তুলনায় তুচ্ছ নয়?

মনের বিষয়ী অংশ এ কথায় একটু হাসিল, অর্থাৎ সে রফা করিতে রাজি নয়। ইহাতে মনটা বড় খারাপ হইয়া রহিল।

মন খারাপ হইবার আরো একটা কারণ ছিল। সংবাদ আসিয়াছে উত্তর বঙ্গে ভয়ানক জলপ্লাবন, সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন—প্রতিদিন অনাহারে লোক মরিতেছে, ইহার উপর নাকি মহামারী দেখা দিয়াছে।

অতএব সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া নানা দিক হইতে চাপ পড়িতেছে। টাকা দিবার পথ অনেক কিন্তু ফাঁকি দিবার পথ একটিও নাই।

দুশ্চিন্তার হাত হইতে সাময়িক ভাবে রক্ষা পাওয়া গেল বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাইয়া। জন্মদিন উপলক্ষে সে এবারে বেশ বড় রকম উৎসব করিবে। সন্ধ্যায় ভোজন।

ভোজন-পর্ব্ব শেষ করিয়া সিগারেটটা ধরাইতে যাইতেছি এমন সময় বিষয়ী মন আমাকে দমাইয়া দিল। বলিল—হতভাগা গাধা, তোর পঁচিশ হাজার টাকা গেল কোথায়?

আমি আবার সেই পুরানো কথাটি বলিতে যাইতেছিলাম—টাকাই মানুষের সব নয়, মানুষের তৃপ্তির গভীরতা কি টাকায় মাপা যায়?

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল, একথা মানিলে প্লাবন-তহবিলে টাকা দিতে হইবে, কেননা অনাহারে যাহারা আত্মহত্যা করিতেছে তাহাদের অন্নদান করারও একটা মূল্য আছে।

বিষয়ী মনকে কিছু বলা হইল না। একটা বিমর্ষ ভাব লইয়া বাড়ি ফিরিলাম। আসিয়া দেখি একখানা চিঠি আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে।

আর কিছুই না—খামে পূরিয়া চিত্রা আমার সেই চেক্ খানা ফিরাইয়া দিয়াছে।

বুঝিলাম ভগবান আছেন, নইলে চিত্রা আমার কে!

নৌকাডুবি

সেদিন দামোদর চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে শ্মশান পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া বহন করিয়াছিলাম; অথচ সেই দামোদর চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে আমার পিছনে লাগিয়াছে।

দামোদর যেটা বলিতেছে সেটা ঠিক যেন উপন্যাস।

তাহার বক্তব্য এই যে শ্রাবণ মাসের তেসরা তারিখে যে দিন আকাশ পুরু মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল, এবং বৃষ্টির প্রায় বিরাম ছিল না, সেই দিন রাত্রি নয়টার সময় আমি সাধু ডাক্তারের কন্যার সঙ্গে নৌকা-বিহার শেষ করিয়া একা উত্তরপাড়ার বাসায় ফিরিবার চেষ্টা করিয়াছি।

সমস্ত ব্যাপারটা সাধু ডাক্তারের সম্মতিতেই যে ঘটিয়াছে, এবিষয়ে দামোদর নিঃসন্দেহ। তাহার যুক্তি এই যে আমার বাড়ি কৃষ্ণনগর হওয়া সত্বেও আমি কেন উত্তরপাড়া হইতে ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া কলিকাতা ল' পড়িতে আসি, এবং কেন আমি সাধু ডাক্তারের বাড়িতে চা খাই।

ইহা ছাড়া সাধু ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে লইয়া যে গাড়িতে কলিকাতা আসেন, আমিও সেই গাড়িতে আসিয়াছি ইহারই বা অর্থ কি? এই প্রশ্নগুলি এরূপ ভঙ্গিতে উচ্চারিত যে উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি ফাটিয়া তাহাদের মধ্যেকার অর্থগুলি চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া পড়ে।

সাধু ডাক্তারের কন্যা দুর্গাময়ী দুইবার বি. এ. ফেল করিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার জীবনে এই নাকি প্রথম লজ্জা। পাড়াময়

তাহার সম্বন্ধে যে-সব শ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে, এবং যে-সব অতীত স্মৃতির উদ্ধার হইতেছে তাহাতে দশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে প্রজাপতির দেখা মিলিতেছে না। সাধু ডাক্তার চতুর লোক, তিনি নাকি বিশেষ চিন্তা করিয়াই আমাকে চা খাওয়াইতেছেন।

আমার ল' পড়া নাকি একটা ছলনা, কেননা যে-লোক নৈতিক আইন ভঙ্গ করাতে পশ্চাৎপদ নহে, তাহার পক্ষে ল' পড়া ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

এইটি আমার চরিত্রের একটা দিক মাত্র, এবং এদিকটা সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ। চরিত্রের আরো একটা দিক আছে কিন্তু সেটা সাধারণ লোকের বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এ দিকটার পরিচয় কেহ সহজে পায় না, এবং স্কুলপাঠ্য রচনা শিক্ষার বইতে অলসতার বিরুদ্ধে যতগুলি অভিযোগ আছে ততগুলি অভিযোগ হইতে যে মুক্ত নহে, তাহার পক্ষে আমার চরিত্রের সেই গোপন বিভাগের কোনো আভাস পাওয়া নাকি একেবারে অসম্ভব। দামোদর চক্রবর্ত্তী যে এতটা আবিষ্কার করিয়াছে তাহার কারণ আছে। সে অসাধারণ অধ্যবসায়ী, সে দশ বৎসরের মধ্যে একদিনও ট্রেন ফেল করে নাই, সে কলিকাতার প্রত্যেকটি গলির সঙ্গে পরিচিত, তাহার অগম্য স্থান কোথাও নাই, সে চট্ করিয়া অজানা লোকের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে বলিয়াছে, আমি এবং দুর্গা তেসরা শ্রাবণ বেলা বারোটায় চাঁদপাল ঘাট হইতে মুন্না মাঝির নৌকা ঘণ্টায় আট আনা হিসাবে চার ঘণ্টার জন্য ভাড়া লইয়া লক্ষ্যহারা অবস্থায় নৌকাপর্ব্ব সমাপ্ত করি। আমার সঙ্গে ছিল কবিতার বই, আর দুর্গার সঙ্গে পানের ডিবা।'

নৌকার মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকা, উত্তরে মাঝি, দক্ষিণে দাঁড়ী, উর্দ্ধে ঘন মেঘ, নিম্নে উন্মত্ত গঙ্গা।

তিন জোড়া হিন্দুস্থানী চোখের সম্মুখে দুইজোড়া মদির-নয়ন, এক জোড়া ভীরু অথচ উন্মাদ মন, শান্ত রসনা আর চঞ্চল হৃদয়।

মিনিটের পর মিনিট কাটিয়া যাইতেছে, আমি নীরব, দুর্গা নীরব।

পনের মিনিট পরে নীরবতা অসহ্য হইয়া উঠিল; আমি বলিলাম, দুর্গা, এখন ডুবে মরলেও আর দুঃখ নেই।

দুর্গা তিরস্কারের স্বরে বলিল, এমন অলক্ষুণে কথা দিয়ে আরম্ভ করলেন কথা কওয়া?

আমি বলিলাম, তোমার মত নিষ্ঠুর হতে পারি না। তোমার মুখে আপনি সম্বোধনটা যেন আমাকে পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এত কাছে থেকে এত ব্যবধান কেন রচনা করছ রাণী?

দুর্গা বলিল, যে বড়, তাকে আপনি বলতে হয়, আর এত দিন ত বলেছি। কিন্তু আপনার ষ্টাইলটা আমাকে বড় লজ্জা দিচ্ছে।

আমি খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিলাম, সামনে বসে থাকলে লজ্জা হবেই, পাশে এসে বস।—টানিয়া তাহাকে পাশে বসাইয়া দিলাম। দুর্গা কোনো আপত্তি করিল না।

এই আমাদের প্রথম স্পর্শ।

প্রথম স্পর্শ মনে-প্রাণে কি বিপ্লব জাগাইয়া তোলে তা বিপ্লব-দমনকারীরা বুঝিতে পারিবে না। চারিধারে কেবল চীৎকার, সিডীশন। তাহাদের ভয় নীতিরাজের আসন টলিল। আমি বলি, টলুক না, এটা কড়া গণতান্ত্রিক যুগ, আমরা ডিক্টেটর পর্য্যন্ত মানি না।

দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি নামিয়া পড়িল, সঙ্গে ঝড়ের মত প্রবল হাওয়া। নৌকার ভিতর জলের ছাঁট আসিতে লাগিল। মাঝি দাঁড় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া চটের পর্দ্দা দিয়া ছইএর দুইধার ঢাকিয়া দিল।

গঙ্গায় ঢেউএর নৃত্য, শীতে আমরা দুইজন কাঁপিতেছি ; মাঝিরা বাহিরে ভিজিয়া ভিজিয়া অক্লান্তভাবে দাঁড় টানিয়া চলিতেছে।

এরূপ কোনো কবির বর্ণনায় পাই নাই। আমার মনটা ঢেউএর মত নাচিতে লাগিল, এবং বোধকরি দুর্গারও। চাদরে গা জড়াইয়া বসিয়াছি—তাহার ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া দুর্গার হাতখানা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, যদি ডুবি ?

দুর্গা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। বলিল, ভয় দেখাবেন না, সাঁতার জানি না।—বলিয়া আমার পাশে আরো সরিয়া বসিল।

সেই মুহূর্ত্তে কোথায় আছি, অনন্ত শূন্যে কি অন্তহীন গহ্বরে কিছু ঠাহর হইল না, বেহালার সুরের মত একটা সূক্ষ্ম সঙ্গীত কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

দুর্গা বলিল, ভেঙে দিন না—দেখি কেমন শক্তি।

আমি নির্ব্বোধের মত বলিলাম, কি ভাঙ্‌ব ?

কিছু ভাঙতে হবে না, যান, আপনি ভারি বোকা। বলিয়া দুর্গা আমার হাতের মুঠা হইতে তাহার হাতখানা সরাইয়া লইল।

আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম—কিন্তু কথা কহিল মাঝি।

সে ইহারই মধ্যে কখন বৃষ্টির হাত হইতে সামান্য একটু বাঁচিবার জন্য আমাদের পিছনের চটের পর্দ্দাটা মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া বসিতেই বোধ হয় আমাদের এই ব্যাপারটা দেখিয়া ফেলিয়াছে। আমার কথা শেষ হইবামাত্র সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এ বাবুজি, গঙ্গামায়ী, খেয়াল রাখিয়ে।

চমকিয়া উঠিয়া দুর্গাকে সরাইয়া দিলাম। মনে হইল মাঝিকে

খুন করিয়া দুর্গাকে লজ্জার হাত হইতে রক্ষা করি। কিন্তু করিতে পারিলাম না।

কিন্তু নিতান্ত চুপ করিয়া যাওয়াও ঠিক নহে। গম্ভীরভাবে বলিলাম, কুছ্‌ কিয়া নেহি মাঝি, তুম্‌ আপনা কাম কর।

মাঝি কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

দুর্গার মুখখানা এই লজ্জাকর ব্যাপারটায় মলিন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু বেশ দেখাইতেছে। তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, বেশ মজাটা হ'ল, না?

দুর্গা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, ঘাটে ফিরতে আর কত দেরী?

আমি বলিলাম, বড়জোড় আধ ঘণ্টা। কিন্তু তার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? আমরা যে কবিতাটি রচনা করতে যাচ্ছিলাম, তা কি সমালোচকের ভয়ে থামিয়ে দেব?

দুর্গা বলিল, কত লেখকের কলম ত থেমেও যাচ্ছে।

আমি বলিলাম, সে সমালোচকের ভয়ে নয়, পুলিসের জন্য। পুলিসের দৌরাত্ম্যে কোনো ভাল জিনিস মাথা তুলতে পারে না। আর সে কি আজ থেকে? বহুকাল ধ'রে এদেশে তারা তাণ্ডব সুরু করেছে, শুধু সাহিত্যের ফুলবাগানে নয়, সমাজের বুকেও। সতীদাহের মত এমন একটা স্বর্গীয় আদর্শ পুলিসে নষ্ট করেছে, সমালোচকে কিছু করতে পারেনি।

দুর্গা বলিল, আজ এই মাঝিটাও তা হ'লে সাহিত্য-সমালোচকের স্থান নিয়েছে বলছেন?

আমি বলিলাম, হ্যাঁ ডার্লিং, নিয়েছে। কিন্তু ওকে আমরা অগ্রাহ্য করব।

কথাটা শুনিয়া দুর্গা হাসিয়া উঠিল। এই হাসিতে আমার মাথা

ঘুরিয়া উঠিল। বলিলাম, ওসব কিছু না, যতক্ষণ জলে থাকতে হবে, দেখছি, ঐ মাঝিকে না মেনে উপায় নেই। পয়সাটা জলে গেল।

ঝড় ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, ঐ সঙ্গে দুর্গার ভয়ও, এবং আমারও। মাঝি পাগলের মত আমাদের মধ্যে পড়িয়া বলিতে লাগিল—আমি নাকি দুর্গার সঙ্গে প্রণয় করিয়া নৌকাকে এবং গঙ্গাকে অপবিত্র করিয়াছি, তাহারই ফলে এই ঝড়।

আমি ভীত ভাবে বলিলাম, এখন উপায়?

মাঝি বলিল, কুছ উপায় নেহি, নৌকা ডুববে।

আমি কাতরভাবে বলিলাম, তাই ত মাঝি, কি করা যায়? কিন্তু তোমার ভুলও ত হ'তে পারে, প্রণয়ের চেষ্টামাত্রেই গঙ্গামায়ী ক্ষিপ্ত হবেন কেন?

মাঝি গম্ভীরভাবে বলিল, কেন হোয়েছেন জানিনা, লেকিন হোয়েছেন।

আমি দেখিলাম, মাঝিকে এরকম প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নহে, একটু শক্ত হইতে হইবে। বলিলাম, আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি মাঝি, তোমার কথা সত্য নয়।

মাঝি হাসিয়া বলিল, আপনি ত আংরেজি পড়েছেন, জুডাস যব্ যীশু খ্রীষ্টকে ধরিয়ে দেয়, তখন যীশু কি করেছিলেন?

ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না, আমার ভাব দেখিয়া দুর্গা আমাকে চুপে চুপে বলিল, যীশু তাকে ক্ষমা করেছিলেন।

ইঙ্গিত পাইয়া আমি মাঝিকে বলিলাম, যীশু ত মেষের বাচ্ছার মত নিরীহ আদমি ছিলেন, তিনি ত কিছুই করেন নি।

মাঝি বলিল, তবেই ত ঠিক হয়ে গেল। যীশু কুছ্ কিয়া নেহি, তাই জন্যে গঙ্গামায়ী ক্ষিপ্ত হুয়া।—নৌকা ডুববে।

আমি বলিলাম, মাঝি আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রায় একমত। কিন্তু—

মাঝি বাধা দিয়া বলিল, কিন্তু-কা বাৎ নেহি। আদম যখন ঈভের হাতে আপেল খেয়েছে, তখন থেকে মানুষ নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। নৌকা ডুববে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মাঝি, তুমি কি খ্রীষ্টান?

মাঝি, 'সীতারাম' উচ্চারণ করিয়া বলিল—এক পাদ্রী বিশ বছর আগে ব্যাপ্টাইজ করে দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের সমাজে শয়তানের অত্যাচার এত বেড়ে গেল যে ফেব প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দু হলাম। এখন দেখি, শয়তানটা সব সমাজেই ঢুকেছে। কাজেই জলে ভেসেছি। বাবুজি, এই নদীতেও শয়তানটা আপনাদের পিছু নিয়েছে—নৌকা ডুববে।

মঝির মুখে খাঁটি বাংলায় এ সব শুনিয়া দুর্গা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

আমি ইংবেজিতে দুর্গাকে বলিলাম, মাঝি বলছে, স্যাটান সর্ব্বত্র, আমি দেখছি সমালোচক-স্যাটানের অত্যাচাব সর্ব্বত্র, আর সে এই নদী অবধি ধাওয়া করেছে।

মাঝি হাসিয়া বলিল, ইংরেজিও বুঝি বাবুজি। In these modern times one cannot do without a fair knowledge of English—is it not?—কিন্তু সে কথা থাক। এই পৃথিবীটা যে দিন নেবুলা অবস্থায় ছিল, সেদিন কে জানত, এ একটা কস্‌মিক প্রিনসিপ্ল-এব অংশ! তারপর বৎসরের পিছু বৎসব, যুগের পিছু যুগ চলে গেল, যখন সবাই দেখলাম, এ পৃথিবীটা একটা বিরাট ইন্‌টেলিজেণ্ট বিধানের অংশ—যখন মানুষের উন্নতি হতে হতে দুই আর দুই চার হ'ল অর্থাৎ মানুষ যখন বস্তুর সংখ্যাকে অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম

হ'ল—তখন আপনারা এর 'কস্‌মিক অর্ডারটা'র মধ্যে আনলেন 'কেওস্‌' —নৌকা জরুর ডুবেবে।

[illegible] হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া বলিল, কি বললে মাঝি, দুই আর দুই চার হয়েছে?—চার হয়নি মাঝি, শূন্য হয়ে গেছে।

মাঝি বলিল, তর্ক করব না, আমার কাজ পারাপার করা, মারামারি করা নয়। কিন্তু আমাকে কিছু করতে হবে না—নৌকা ডুবেবে।

মাঝির কথাই ঠিক হইল, হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে নৌকা উল্টাইয়া গেল, আমরা জলে ডুবিলাম।

* * *

এই কাহিনীটা দামোদর চক্রবর্ত্তী আমার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

আমার সন্দেহ হইতেছে দামোদর নেশা করে। কারণ তাহার বাড়ি হইতে আবগারী দোকান মাত্র তিন মিনিটের পথ।